সোনার স্মৃতি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

১এ রূপচাঁদ মুখার্জী লেন
ভবানীপুর
ক'লকাতা—২৫

প্রথম প্রকাশ—বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৭০

এ গ্রন্থের প্রচ্ছদপট সমীরকুমার রায়চৌধুরীর

শ্রীমতী রায় কর্তৃক ১এ রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, ভবানীপুর, ক'লকাতা-২৫
থেকে প্রকাশিত ও শ্রী এন. এন. পাত্র কর্তৃক ভারতী প্রেস থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার ছোট গল্প-রসিক
ছোট বন্ধু—তোমাদেরকে

'জ্যোতিকাকা'

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর গল্প

অশোককুমার রায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গের রাগ আলাপন বহিরঙ্গের বিচিত্র স্বভাবে মিলে মিশে কেমন আপন প্রিয় হয়ে রূপনির্ঝর ফোটায় সূর্য্যমুখীর সূর্য্যায়ণে প্রতিভাসিত সত্যান্বেষণে—তারই গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। বলিষ্ঠ মানস সত্যের রূপ-অরূপের কারুকাজে তাঁর বক্তব্য মুক্ত বিহঙ্গমের মত ভাবনার হাজার তরঙ্গ-ভঙ্গে নয় বিচলিত। নয় এলোমেলো, দিশাহীন। স্থির আর শান্ত স্বভাবের সুন্দরতায় শিল্পীর বোধজ্ঞান আপনাতে আপনি খুশীবিহ্বল। আর প্রকৃতির আলাপনে রূপ-মহাদেশের আনন্দঝরার মধ্যে নিষ্ঠচেতা। লেখক তার সাহিত্যায়ণে অনেক ভাবনার পশরায় সাজিয়ে, গুছিয়ে, অনেক কাহিনীর রূপদান কোরেছেন এ পর্য্যন্ত। কোনটির আধার উপন্যাস, কোনটি গল্প। তবে গল্পই সংখ্যায় বেশী। শুধু যে এক বিরাট ব্যাপকতা নিয়েই কথাসাহিত্য উপন্যাসে পরিসীমিত তা ত নয়,—চোখে না পড়া, চিনতে পেরেও জানতে না চাওয়া ডেইজি ও ঘেঁটু বা সন্ধ্যামালতীর মতই কত ছোট ছবি, ছোট ছোট ভাব, ছোট সুখের এতটুকু খুশীর কথা, কত ছোট দুঃখের সাময়িক যাতনা, মনমদির প্রণয়-কাকলীর রঙছুট কথা, ছোট স্বার্থের জন্য অযাচিত লোভ ও তার সাময়িক সংক্রমণ, কত পথের চলমান জীবন ধরা সালতামামি, সামাজিকতার হাটে-বাজারের পাটোয়ারী কথার শিল্পী রূপেই তাঁর ছোট ছোট রচনায়, গল্প করেই সাজিয়েছেন। রাঙিয়েছেন মনসিজার মত সুনিশ্চিতা কোরে।—ভাল ভাবেই বলতে পারি—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানসবিহার কোরেছেন মূলতঃ ছোট গল্পের সীমিত দুনিয়াদারির পরিবেশে, প্রমিতিবোধের পরিবেষ্টনীতে। তাঁর গল্প একটি বৈশিষ্ট্যের ওপরে আলোকপাত করে, যা সহজেই উপলব্ধি করায় তাঁরই লেখা গল্পের দুটি ধারায় পরিবেশিত কাহিনী-সম্ভারের জল্পনা-কল্পনার। একাধারে অভিজ্ঞতার বোধসঞ্জাত চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ভাবলোকের সঞ্চারমান রূপযান চড়ে কল্পনার রঙবাহার মাধুরীতে হোয়ে ওঠে আদর্শরকম রোমান্টিক সৃষ্টি। ভাষায় ভাষায় চলে রং-তুলির

চিত্র-কুশলীতা, সুদূরাভিসারের আহ্বানে, রাগে, অনুরাগে, প্রেমের কবোষ্ণতায়, ঋতুরঙ্গীন বিচিত্রায়। মুঠো মুঠো অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকা, ম্যাগনোলিয়া, কাঁঠচাঁপা, পলাশ—মনসুখকর হয়ে দাঁড়ায় গল্পশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সুগভীর কল্পনার ইন্দ্রজালে বোনায়। সে সব গল্পের রভস কথায়, সুরলোকবিহারিণী সুতনুকাদের যৌবনবিহ্বল আবেশ কথায়, বরপুরুষের আকুতিঝরা আকাঙ্খার চাওয়াতে ভুল কোরে ভুল বুঝতে মননিষ্ঠ প্রেমবিলাসের রসনির্ঝর কথায়। এখানে লেখকের সুনিপুন ভাষাশিল্পায়ণের রূপনিষ্ঠার মতই নায়িকারা মনসিজের তাগিদে, দেহদেউলে সাজায় বনফুলের সুরভিতে ভরানো যৌবনের আলপনা। যুবতীর মন তাই সংস্কারমুক্ত মনবিলাসের মাদকতায় হিল্লোলিতা। শিল্পীর "মীরার দুপুরে"র জীবনের মানে খুঁজে ফেরা সুখান্বেষী মীরা, বারো ঘরের বরনারী সুরুচি, পূর্ণিমার রাকায় সাজানো শুধু "আলোর ভুবনে"র বিশাখা, সূর্য্যের প্রখরতায় ঝলসানো "গ্রীষ্মবাসরে"র জয়তী-তপতী-লিলিরাই তাঁর সমস্ত গল্প-কল্পনার আঙ্গিনাকে রঙ্ও বেরঙে, ঋতুতে ঋতুতে ভরিয়ে রেখেছে। এখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সুন্দরের প্রেমিক।—সত্যি অসুন্দর বলে কিছু নেই। অসুন্দর যে চোখে দেখার ভুল। মনে বোঝার অসুবিধা। তাই ত এ পৃথিবী—আলোর ভুবন। রূপঝরা থেকে লেখকের আকুতি নির্ঝরেতে ভাসে—"স্বর্ণচাঁপা গাছ। কিন্তু ফুল সুন্দর কি পাতা সুন্দর! সোনারঙ চাঁপা-ফুল, চাঁপাকলির দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়ায়। সবুজ নধর পাতাগুলিও ত কম সুন্দর নয়। ফাল্গুনে কুঁড়ি ছিল। চৈত্রে কিশলয় হল। আর বৈশাখ পড়তে যৌবনপুষ্ট হয়ে প্রত্যেকটা পাতা আকাশের নীল ছুঁয়ে দেখতে আকুল হয়ে উঠেছে। অনন্তে তৃষ্ণা? অনন্ত সৌন্দর্যের পিপাসা?" তারপর "...রুনি ফুলের আগুন আর পাতার সবুজ দেখতে দেখতে ভাবছে—কেবল কি মানুষ, গাছের ফুলটি পাতাটিও আলোর দিকে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দুর্নিবার পিপাসায় ক্ষণে ক্ষণে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাটির বন্ধন ছেড়ে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু পারে কি? পারে না। সহস্র বাহু শিকড়ের শিকলে আটকা পড়ে ফুলের দল, পাতার দল কাঁদছে। কাঁপছে। দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় গাছের সেই কান্নার সুর, পিপাসার দীর্ঘনিশ্বাসই ত থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মানুষ পারে, রুনি পারে বন্ধন ছিঁড়ে বাঞ্ছিতের কাছে ছুটে যেতে। চাঁপার আগুনের চেয়েও দ্যুতিময়, সবুজ নধর পাতার চেয়েও লাবণ্যভরা একুশ বছরের এক নগ্ন পুরুষ দেহের আশ্চর্য ঐশ্বর্যের এ কী দুর্নিবার

আকর্ষণ। রুনির চোখ বার বার ফিরে যাচ্ছে সেদিকে। নিজেকে শাসন করতে গিয়ে—"

বাস্তবে রুনিরা মানে অন্যান্য আধুনিকা বরবর্ণিকারা নিজেদের ও-ভাবেই শাসন করাতে চায়। কিন্তু পারে না। ওরা যে আধুনিক ইভ্‌। এখনও অভিশপ্ত—যদিও নিজেদেরই কার্য্যকারণ পরম্পরায়। তবু স্বপ্ন দেখে। কল্পনা আঁকে মনেতে পৃথিবীর কোন এক নিরালা কোণে শান্ত পরিবেশে একটুকু সুখের জন্য ছোট্ট একটা নীড় বাঁধার জন্য কোন এক সমবয়েসী সুজনের সঙ্গে। তবু ভুল হয়। আসে হঠকারিতা। জাগে লোভ। মনে থাকে শঙ্কা। নিশ্চয়ে তারা হয়ে পড়ে অনিশ্চিতা। দোষ—ওরা স্বাধীনা মনের হতে চায়। বিদ্রোহিনী হয়। কিন্তু, তারপর যথাপূর্বং তথাপরম। ওরা হাসতে হাসতে, কাঁপতে কাঁপতে ভুলে যায় আপন ব্যক্তিত্ব উন্মেষের কথাকে। ওদের মনের প্রেমাকুল মিনতির সুযোগে পুরুষের প্রেম সময়ে সময়ে লোভের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। নিঃশেষে সুনিশ্চিতাকে ব্যবহারে, প্রয়োগে, মিথুনলগ্নে অপবিত্র কোরে তোলায়। আবিলতার অমা রঙে ঢাকে। আবার সময়ে সময়ে প্রকৃতির পরিহাস যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয় নারীকে দিয়ে প্রীতির মানুষটির সরল মনেতে আঘাত হেনে। ঠকিয়ে। এমন মলিন পরিচয়ে, আবিলতা ঢাকা পরিবেশে নর-নারী দুই-ই একই স্বভাবের হয়ে ওঠে।—ঠকো অথবা ঠকাও, নয় ত কেউই ঠকো না।—সত্যি আজকের দারুণ জটিলতায় ভরাট সমাজের তথাকথিত সামাজিকতার ভেতরে যেসব মলিনতা, অপবিত্রতা দেখা দিয়েছে নিছক স্বার্থ, প্রতিপত্তি, বিত্ত, সুনামের মিথ্যা মোহে, তার সব কিছুরই অপ্রতিরোধ্য ছোঁয়াচ জনমানস অতিক্রম করে পুরুষ ও রমণীর দাম্পত্য জীবনের আগে ও পরে—সর্বত্রই ছন্দহীন কোরে দিতে চাইছে। অমিল, অসামঞ্জস্য রূপ ছড়িয়ে গেছে।—জোরাল ভাবের চিত্রপটে ব্যক্তিত্ববাদী কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এ সবেরই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এক ধারার গল্পে প্রেমই মুখ্য। নায়ক-নায়িকার গীতালীমুখর জীবন-যৌবন অভিসারকুঞ্জের কাকলীকথাতেই ভরানো। সে ধারায় থাকে গল্পলোকীয় বিচিত্রিতা। প্রমাণ বহন করেছে 'নায়ক নায়িকা' 'চার ইয়ার' 'চামুচ' 'সমুদ্র' 'গিরগিটি' 'চন্দ্রমল্লিকা' 'ট্যাক্সিওয়ালা' 'বনানীর প্রেম' 'শালিক কি চড়ুই' 'ষ্ট্যাম্প' 'ক্যাম্যাক্ স্ট্রীট' 'মহীয়সী' ও আরো অনেক গল্প।

জ্যোতিরিন্দ্র গল্প-সাহিত্যের অন্যধারায় যে সব গল্প সুন্দর রূপায়ণ হয়ে

আছে—তার প্রত্যেকটির লক্ষ্য হচ্ছে কৃত্রিমতায় সাজানো সমাজের লোকদেখানো সামাজিকতা, তার ঈর্ষা, লোলুপতা, ব্যাভিচার, সমাজনীতির সঙ্গে রাজনীতির সংঘর্ষে জাগে যে সব অসত্যতার স্বার্থান্বেষণ, সর্বোপরি মারাত্মক পরশ্রীকাতরতার প্রধূম্র বহ্নি। এ সব গল্পের পরিকল্পনা এসেছে যন্ত্রণা-কাতর মানুষের অকাল বসন্তে ছাওয়া অবেলার সুর হারানো ব্যথা থেকে, হতাশা থেকে। 'স্যাডেষ্ট্ থট্' থেকে জীবনের গল্প সহজ সুরে গেয়েছেন এখানে সুদক্ষ কথাকার। পুষ্পধন্বার মাদল বাতাসে বোধ হয় 'ট্যাক্সিওয়ালা' গল্পের সুন্দরী নায়িকা নিজেকে পরিপূর্ণা নারীর তৃপ্তির ভুবনে দাঁড় করাতে পারে নি। তার জীবনে জ্বলে ওঠা দ্যুতি হঠাৎই আঁধারে ঘিরে যায়। ট্যাক্সিচালক যেন নিজের হয়ে ওঠা সমাজসচেতনতার দর্পণে এ মেয়েকে তার লাঞ্ছিত রমণীত্ব সমেত বুঝতে পেরেছিল। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, আজকের সভ্যতার অলঙ্করণে ঝকমক্ করা শহরের সওয়ারীবাহী যে কোন ট্যাক্সিওয়ালারই জীবনে অনিবার্য কারণেই এসে যায় নানান ঘটনার চমক দেওয়া অভিজ্ঞতা। এ থেকে সারাদিন গড়িয়ে রাতের নিশুতিপুরের যাত্রী-বন্ধুরূপে তারা যে জ্ঞান পায়,—তার ধারণা থেকে অনেক সময়েই আমাদের সভ্যতার আর মনুষ্যত্বের গর্ব নিরাসক্ত নির্বিকার ট্যাক্সিচালক যুবকদের কাছে পরিহাসের মত ধিকৃত হয়। ওরা ভাবে—এই কি শিক্ষা? এই বুঝি রুচি? এরই নাম সভ্যতা?—নিজের জীবনে আপন পরিণীতার কাছ থেকে হঠকারিতা পাওয়াতে আজ সে তার আবেগ, অনুরাগের জগত ছেড়ে একরকমেরই এই যাযাবরী বৃত্তির ট্যাক্সির-চালক ও মালিক হওয়ায়, কোন কিছুর ওপরেই আর তার ভয়, করুণা, মমতা নেই। সে নির্ভীক আর দৃঢ়চেতা, ঠকানো সমাজের রূপের কাছে। এমনি পরিবেশে তার সঙ্গে সওয়ারী রূপেই পরিচিতা হয় এই যুবতী,—যে পরিচিতিতে রমণীয় রমণী, সাজে পরিবারের বধূসদৃশা। কিন্তু—হ্যাঁ, আজ নিজের অপমানিত নারীত্ব নিয়ে সে তার দেহের যৌবনের বাঁকে বাঁকে ধরে রেখেছে রতির রঙ--ঝাঁকে ঝাঁকে অপেক্ষারত অনেক পুরুষের মৌ-চোখের লোভী দৃষ্টির কাছে। তারা নেয়, সময়ে অনেক বেশীই —কিন্তু ওর মত মেয়েরা পায় না কিছুই। না সম্মান। না ঘর বাঁধার সুনিশ্চিত আকুতি। সমাজ বলে, ওরা অপবিত্রা। ভ্রষ্টা। অসাকন্যা। কিন্তু —মানবতাবাদ তা বলে না। এই যুবতীর দেহ-বেসাতির পেছনে আছে দারুণ ইতিহাস। সে ইতিহাস এত স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়, যার সংস্কারের জন্য

কোন প্রয়োজন বোধ হয় না নির্মোক জড়ানো সমাজের। ওর আকাঙ্খা পৃথিবীতে কোন দিনই বোধহয় পূর্ণতা পাবে না। সে কাঁদবে আড়ালে। আবার সাজাবে দেহ-বেসাতি রতিলোভী হঠকারীদের জন্য। তারা আবিলতায় ভাসাবে নারীসত্বমকে।—তবু অলকারা এগিয়েই আসবে। কারণ তারাও বাঁচতে চায়। আর বাঁচার জন্য—চাই অর্থ। তাই দেহবাদের জগতে নারীর দেহমঞ্জিলে চলে বিকিকিনির হাট-বাজার—দেশে ও দেশে, সর্বত্রই। এ নারী নিশ্চয়ই ভুল করেছিল চালককে বুঝতে, এমন অবস্থায় ওদের মনসমীক্ষা এসে পৌছয়, যেখানে তারা প্রথম চাহনিতেই পুরুষকে ভাবে ঋতুরঙে ধাঁধানো আসঙ্গ-ইপ্সিত। কিন্তু তা ভুল জেনেও এই যুবকের বেলায় সে ভুলই করেছিল তার মনসজি স্তনুর উরোজ রূপের বক্ষশ্রীর পীনোদ্ধতাকে নিরাবরণা করানোর মধ্যে। এই ট্যাক্সিচালক আজ এমন এক অনুভূতির দেশের মানুষ, যেখানে তার সেক্স কৃষ্ট্যালের মত কঠিন। নিশ্চল।' নারীর কোন আবেদনই তাকে অচলায়তনে টানতে অক্ষম।—লেখক এই ভাবনাকেই সহজ সুরের সরল কথায় গুছিয়ে তৈয়ার করেছেন তাদের জীবনের কঠোরে-কোমলে গাথা এক 'সুইটেষ্ট সঙ্।'

আধুনিকা বরকন্যার কাজল চোখের দীঘল কোণে ঝলকানো অন্তরের আপন আর আঁধার ঘেরা জীবনের মুঠো মুঠো রভসকে নতুন জীবনের মানে তুলে ধরা রূপকথা কোরে তুলেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার 'শালিক কি চড়ুই' 'চামুচ' 'গিরগিটি' 'সমুদ্র' গল্পের মনসমীক্ষায় প্রকাশমান চিন্তাজালের দুর্ভেদ্য অমামিশায় আপ্ত রোমাঞ্চে।—এ সব গল্পে এমন এক না বোঝা ভুলের জগতের ভ্রান্তিবিলাস সাজানো হয়েছে। বর্তমান যুগে দাম্পত্য জীবনের প্রেমবিলাস রতিবিলাসের নিরাবরণ নিরাভরণতায় ব্রীড়াবনত হতে চায় না।—চায় না একে অপরের ইচ্ছায় স্বাধীন ভাবে উদ্ভুত ইগোটীজম্ থেকে সহজে আর স্বেচ্ছায় তা বরণ কোরে নিতে। সামাজিক, পরিবেশগত শৃঙ্খলা, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় থাকা সত্বেও রাকা রজনীর নিশুতিলগ্নে মধুমাসের আহ্বানকে দম্পতিরূপ অযথা অকারণে অবুঝের মতই করে বসে ভুল মিথুন-কল্পনায়, ঋতুরঙ্গীন আলোর ভুবনে। ভুলে যায় প্রীতিলোকের আনন্দনির্ঝর কথা। ভাললাগার নিছকতার পরিবেশে দেহাচারীতায় বেশী কোরেই ভুল বোঝার পরেও ভুলকেই ধরে রাখে হেমকান্তি ভালবাসার নিকষিত রূপকে না মানার মধ্যে। প্রেম মুক্ত বিহঙ্গমের মত শরীরী লিপ্সার মাদকতার

বিলোল হিল্লোলতায় নজরবন্দী হয়ে মুক্তির আস্বাদনে রংচংএ ফুলবাহার ডানা নিয়ে ঝট্‌পট্‌ করে চলে। কামনা তখন দেহদেউলের নিগূঢ় রাগালাপে প্রমত্ত প্রহরগুলোকে গুনে গুনে যায়, পলকে পলকে অকারণ পুলকে। তারপর, কখন রূপমদিরে ঝলসানো দুটি আধুনিক প্রাণ সুপ্তিলোকে ক্ষণকালের মৃদু মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনবাসরকে মনে করায়, ধন্য, তৃপ্ত করান হয়েছে।—কিন্তু পরমুহূর্তেই যতিভঙ্গ হয় 'গিরগিটি'র মায়ার মধ্যে প্রণবের সান্নিধ্যে, 'পতঙ্গ' গল্পের দেহচেতনায়, 'শালিক কি চড়ুই'এ দম্পতি জীবনের শেষ চমকে, 'চামুচে' সব অনুকূল থাকার পরেও প্রতিকূল করার জন্য অশোক-সরলার অভিপ্রায়ে, 'নায়ক-নায়িকা'র কুহেলি-স্বভাবে, 'গোঁয়ার' গল্পের যুবক ব্যারিষ্টার রথীন রায়ের পুষ্পবিলাসিনী প্রিয়া-স্ত্রী রেবার সুখীপ্রাণেতে জাগা সংশয় কথায়।—ওরা সকলেই লেখককে ভাবিয়েছে। পাঠকও ভেবেছে তা পড়ে পড়ে। সব থেকে বেশী কোরে দোলা দিয়ে যায় সমাজ মানসের মুকুরেতে।

প্রথমে 'গিরগিটি' গল্পের ভেতরকার রং-বেরং কল্পনার মায়াজাল বিস্তারের পটভূমি ধরে আমরা আলাপনে আসছি। প্রিয় আর অপ্রিয় দুই ভাবেরই সমতা ভরানো এর কারুকাজে, গল্পায়ণের আলাপনা সাজনোয়। গল্প তার আরম্ভে পাঠকের ভাববিলাসকে এক নয়নাভিরাম বর্ণনার প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করায়।—একটা বিষয়ে আমরা জ্যোতিরিন্দ্র-সাহিত্যের সুন্দর আবেশমুখর মুহূর্তের রূপায়ণে দেখতে পাই—মানুষের, বেশী কোরে যুবতী হৃদয়ের রঙে প্রকৃতি তার ঋতু-বিচিত্রা নিয়ে কত গভীর ভাবে মোকাবিলায় মিতালী পাতায়। রাঙায় পলাশ ফুলের মত মুখরুচিকে। ফোটায় সুস্মিত ব্যঞ্জনা, রক্তবরণ অধরের কাঁপন বিলোলতায়। আর দেহের যৌবন সবুজ গাঙে গাঙে। এর পরেও দেখা যায় পুরুষের এলোমেলো স্বভাব শান্তরাগে ভরে ওঠে।—বর্ণনার সময়ে গাছ, লতা, ফুল, পাখী, ঝর্ণা, ছোট্ট নদীর কলহাস, দোয়েলের শিষ্‌, টিয়ারঙের মসৃণতা, পূবালী হাওয়া, এমন কি বরবর্ণিনী রেবা রায় কলাবতীর গর্ভকেশরের সুরভিতে মাতোয়ারা হওয়ায় তার টিকোলো নাকের প্রান্তে ওর হলুদ রঙ পরাগরেণু পর্যন্ত আঁকা হয়ে যায় বিন্দু বিন্দু—এমনি প্রকৃতির উদার রাগ-আলাপন ভাষার মধুময় সত্তায় ভেসে ভেসে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের প্রকৃতি-নিষ্ঠতার পরিচিতিকে বিশিষ্ট করে রেখেছে।

অষ্টাদশী মায়া আর বাইশ বছরী প্রণব, আর তাদের বসন্ত মাদল বাতাসে কাঁপানো যৌবনবিলাস স্বামী-স্ত্রীর মিথুনচেতনায় পথ খুঁজে ফিরে চলেছিল।

'গিরগিটি' গল্পে, নামকরণে একটা রূপক ধরা হয়েছে। আর তার প্রতীক, মায়া নিজে। প্রণবের কাছে তার অস্তিত্ব দেহদেউলের সুখাবেশের তাড়নায় সরীসৃপের মত ধীরা, মৃদুলা, গতিতে আবেগ মথিতা। যৌনচেতনায় লাজহরা। প্রণব শান্ত। সুস্থির। যৌবনান্বিতার অনুরাগের পরশে সে নিথর। নিশ্চলতায় অনুরঞ্জিত। ভাবে, প্রকাশে সে শুধু যুবক। আর বেশী কিছু নয়। মনে হয়, ভাবতেও চায় না। কী তার নেই, তা নিয়ে। যুবকের মধুক্ষর যৌবনত্ব নিয়ে আপন পরিণীতার যৌবনকে কি ভাবে রাঙাবে, নির্লাজ করাবে, সে সম্বন্ধে সে অবুঝ। প্রণবের সরল মন শিশু বিলাসের মতই মায়ার সান্নিধ্যে ভুলে যায় মনের আকুতি জাগা মিনতিতে ঝরে পরা শরীরচারিতার কথা।—ভুল বোঝে, যৌবনের তাগিদে প্রিয়ার সবুজ দেহের নিরাবরণা যৌবনকে পুষ্পায়ণ মানসে লাজহীনা করাতে। দেহে দেহে ডাক দিয়ে যাওয়া সোনা ঝরা রাকাতে আলপনা আঁকা সে মিথুনযোগ। প্রথম প্রথম প্রণবের মধ্যে দেখতাম সেক্সের অনুভূতিহীন কৃষ্ট্যাল রূপ। বলতে বাধা নেই, শুধু প্রেম মিথুনবিলাস ছাড়া অপূর্ণ। আবার শুধু দেহবিলাস ইর্‌রেশনাল্। অমানুষিক। আর এ দ্বন্দ্ব থেকেই বহ্নিমান হয়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীর প্রীতিঘেরা আঙ্গিনা। তাদের যৌবন ধর্ম অন্ধকারে ডুবে যায়। সেই সমীক্ষার অনুরণনেতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাববিলাসিনী মায়ার আঠারোর দুর্দম সুখ নিজের রূপের প্রেমে নার্সিশাস্ হয়ে উঠেছিল।—

"দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা বড় আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস্ দেওয়ার মতন একটা সুর জিব ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে রেখে তার পর এক সময়···গায়ের জামার বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপার বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারো গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট পাতলা কপাল আর দু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে মণি দুটো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুঁতনি। নিজের কাছে ত বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুঁতনিটা যে কত প্রিয়, তা মায়া এই দু' বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর

করতে সকলের আগে প্রণব এই থুঁতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয় তো থুঁতনির ওপর নিজের গালটা চেপে ধরে ঘষবে।" আর এমন ভাবনা যাকে নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন রাখে, সে ভাল লাগাতে পরছে না প্রণবের কাছ থেকে পাওয়া আঁধারের রভস মিলনের উচ্ছ্বাসকে—"...সব কেমন যেন মায়ার কাছে পুরনো, বড় বেশি একঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মাবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় হয়ে এলো। এমন কি রাতটাও। আদর চুমা আবেগ উচ্ছ্বাস, কোন কিছুর মধ্যেই আর ও দিশেহারা হয়ে যেতে পারছিল না। যেন কতকাল ধরে চলছে। যেন এসব কাজ এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলে ভাল হয় ...বিছানার অন্ধকারে আধশোয়া স্বামীকে...বেশবাস 'ছেড়ে নিজেকে কুৎসিত মনে হয়।"—মায়া প্রণবের কাছ থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু আত্মপ্রীতির সৌগন্ধে সে তার রূপকে প্রকৃতির অনাবিলতার মধ্যে মুক্ত করাতে, সূর্য্যের পবিত্র ছটায় সাজাতে খুশী হয়।—"একলা মায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ তা দেখছে বলে আজ আর সে মনে করতে পারল না। অথচ ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হাঁ, সহস্র পাতার চোখ মেলে এ বাড়ীর নিমগাছ, রোদ কি জল ঠেকাতে বড় বড় ছাতা মাথায় ওধারের পেঁপে গাছগুলো, এ ধারের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো পর্যন্ত; ইটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে, নাভি দেখে, স্তন দেখে, জঙ্ঘা দেখে। কচি কলাপাতার বোঁটার মত ওর পিঠের ঋজু মসৃণ শিরদাঁড়া..."—প্রকৃতির উদার আকাশের নীলিমায় যেমন সে নিজেকে আদুর কোরে ধরে, তেমনি চার দেয়ালের নিঝুমতায় বনানী-কন্যার নিলাজতায় নেচে ওঠে—"দুপুরে খাওয়ার পরে চোখে আজ ঘুম আসে নি। শুতে গিয়ে শোয়া হোল না। এক আশ্চর্য্য নেশায় মন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সত্যি ত। মরা মাদার গাছ বা নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ওঠে, 'চমৎকার, কত সুন্দর তুমি,' অথবা 'তোমাকে দেখে বর্ষার রজনীগন্ধা, কি বৈশাখের চাঁপার কথা মনে পড়ে আমাদের' তা সে কি খুব অবাক হবে? হয় নি। এখনও হোল না। বরং নূপুর বাজার মতন উত্তেজনায় আনন্দে তার রক্তের মধ্যে একটা মিষ্টি রিমঝিম শব্দ হচ্ছিল। সেই কখন থেকে। শোয়া ছেড়ে এক সময় ও উঠল। আস্তে দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল।

তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশীতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত দেখতে পায়। না, আরশী মুখ করে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। সব বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিল ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। না, নিজের মূর্তি সে ওর আগে কখনও দেখে নি এভাবে। ডালিম গাছ, পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগল্ভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল। টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ করে তখন বেজে উঠল ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঘরের চালে শব্দ হচ্ছিল। বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে। কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশ ভেঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামল। আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটিবার ও নিজেকে দেখল।"

মায়া এখানে যা করেছে প্রগল্ভতায়, তা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, আমরা তাই মনে করি। নূপুর ছন্দ প্রত্যেক প্রেমিকা কন্যার মধ্যেই থাকে। অনেক সময়ে বেশী কোরে। প্রকৃতি-প্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এখানে তার স্বাভাবিকতাকে ভাষায়, ছবিতে মুখর করে তুলেছেন। স্বীকার করতে হয়। তাঁর আঁকা মানসিক ছবিও অপরূপ কারু-কাজে ভরা।—শেষ চমকে 'গিরগিটি' গল্পের প্রগল্ভিতা যে সমস্যায় পৌঁছেছে, আমাদের মনে হয় তা আরো বেশী রোমান্টিক ও ভাববিহ্বল হোত, যদি ঠিক প্রণবের ক্রন্দনরত মুহূর্তে তা সমাপিকা হোত। মায়া প্রণবের বুকের প্রমত্ত প্রহরকে আবেশে, আহ্লাদে, আলিঙ্গনে যদি ভরিয়ে দিত। চিন্তার বেড়াজাল থেকে মুক্তা মায়া বুঝতে পেরেছিল নিজেরই ভ্রান্তিবিলাসে—"সত্যিই প্রণব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন বালিশ ভিজে যাচ্ছে।"—তবু সে মুক্তিপ্রিয়া হোতে চেয়েছিল। শুধু দেহের দোসর নয়। মায়া প্রণবকে বলেছিল—"হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতারা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোন মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না।..."

রূপঝরার মুক্তিস্নাতা মায়া যেমন 'গিরগিটি'তে দেহচেতনায় বিহ্বলা, বনানীকন্যার মত প্রগল্ভা,—তেমনি ভাববিলাস কত নিষ্ঠুরতায় প্রকাশ পেতে পারে বাস্তবের কুটিল ঈর্ষার মধ্যে, তারই আশ্চর্য ঘেরা কাহিনীকে

তুলে ধরেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর "হিংসা" গল্পের নায়িকা রেবার মধ্যে। আগের গল্পে দেখেছি প্রণবের না মেটা শরীরচারিতার কথা যেমন দ্বন্দ্ব বাঁধিয়েছিল প্রেমের পরিণীতার সঙ্গে—এ গল্পে দেখি দম্পতির প্রেমরূপ কোন স্থান পায় নি, যদিও পাশাপাশি দুটি ঘরে রেবা ও মীরা,—দুজনেরই দাম্পত্য-জীবন ঘিরে আছে দুটি কর্মিষ্ঠ পুরুষের অস্তিত্বে। স্বভাবে। প্রতিষ্ঠায়।—যা নিখুঁত নিটোলতা নিয়ে ঈর্ষার ইন্ধনকে প্রধূমিত কোরেছে, তা হোল মাতৃত্ব। যদিও তা একজনকে ঘিরে আরেকজনার 'হিংসা'। একজন ঝুনুর মা রেবা। তার ছেলে নাই। অন্যজনা মীরা, তার সুনু—একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে। এই মীরাকে সহ্য কোরতে পারল না রেবা শেষ পর্যন্ত। কারণ মীরার সৌভাগ্য দর্শনে। রেবার তুলনায় কত ভাগ্যবতী এই মীরা, সন্তান ভাগ্যে আর স্বামীর ঐশ্বর্য-গর্বে। গল্প আরম্ভ হয়েছে প্রতীক ধর্মে—ঝুনুর মা দেখছে তার স্বামী একটি মুর্গি কাটছে। এমন এক মুর্গি যে আর দু'দিন বাদে ডিম পারত। এমন সময়ে প্রতিবেশিনী মীরা এলো। রেবা দেখল মীরা প্রজাবতী। আসন্নসম্ভবা। জানল এবারও তার ছেলে হবে। আর রেবা? এক মেয়ে ঝুনু ছাড়া ছেলের অভাব তাকে হিংসা করতে শেখাল মীরাকে। মনে কুচিন্তা জাগল—মীরার অবস্থাকে কি ঐ ডিমভরা মুর্গিটার মত নিশ্চুপ করে দেওয়া যায় না! আবার শুনল রেবা, ওর স্বামী নাকি অফিসার হয়েছে। অফিস থেকে বিলেত পাঠাচ্ছে। কত আনন্দ মীরার! আবার সে মা হতে চলেছে। এক ছেলে থাকা সত্ত্বেও আবার আরেকটি অচিরে হবে। এত সৌভাগ্যকে হিংসা না করে পারল না রেবার সামান্য নারী মনের তুচ্ছতা, নীচতা। অবশ্য কেন এমন হয় নারীর স্বভাবে, এর সমাধান মনসমীক্ষাও সমাধান করতে অপারগ। এ গল্প পথ চলতে থেমে গেল মধুরা মীরার অকালমৃত্যুতে। রেবার কথায় পিছল কলতলায় যেতে গিয়ে মীরা পিছলিয়ে যায়, তারফলে অসময়ে হোল কুমারসম্ভব ও নিজের মৃত্যু। এর জন্য রেবা দায়ী। রেবার পুত্রাকাঙ্খা আর স্বামীর অভাগ্য তাকে প্ররোচিত করেছিল এরকম অমানবিক কাজে—যা স্বাভাবিক নয়। তবু মনের, দেহের অতৃপ্তিতে, আর চাহিদায় রেবার মত নারী কুৎসিত কিছু করে বসে!—সব থেকে কৃতিত্ব লেখকের। তিনি রেবা ও মীরার দ্বন্দ্বকে হিংসায় টেনে যে সব উপমা, কল্পনা, প্রকাশে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তা গল্পের রূপায়ণকে নিখুঁত করে তুলেছে। এক জায়গায় প্রজাবতী মীরার সৃষ্টিরূপ অবলা প্রাণীর মধ্যে তারই আসন্ন অবস্থাকে নীরিক্ষা করতে চাওয়াটা

অনুরঞ্জন করেছে বর্ণনাকে ঈষৎ লাজ রঙে ছাপিয়ে—"...ডিমওয়ালাগুলো (মুর্গি) বড় একটা কাটা হয় না—তাই তো তখন ছুটে গেলাম তোর বর যখন ঐ জাতের একটা কাটছিল—পেটের ভেতরটা দেখব বলে—হি-হি—' এবার ঝলক দিয়ে হেসে উঠল মীরা। আর ওর ফুলো পেটটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। যেন কি ভেবে শিউরে ওঠে রেবা,—মুখে শব্দ নেই।—'তাকিয়ে দেখছিস যে দুষ্টু মেয়ে—হঠাৎ আমার ওদিকে তোর নজর পড়ল কেন?' মীরা আরো জোরে হাসে। অপ্রস্তুত হয়ে রেবা চোখ সরিয়ে নেয়। লাল হয়ে ওঠে। তারপর অল্প হেসে মীরার চোখে চোখ রাখে।"—

একরকম অভাবনীয় কল্পনাকে কত সরল চিন্তায় ফুটিয়েছেন, বক্তব্য সমৃদ্ধ করেছেন তার প্রমাণ মেলে "তিন বুড়ি" ও "বৃষ্টির পরে" গল্প দুটিতে। আমরা বোধ হয় কখনও ভাবতে পারি না, আর না ভাবাটাই স্বাভাবিক যে—একদিন আমাদের বয়েস বাড়তে বাড়তে বৃদ্ধের শেষ পরিসীমায় এসে স্থানান্তরিত হতে হবে ওপারের উর্দ্ধায়ণে। ভাবলে পর শিহর জাগে। বিস্ময়কে চাপা দেই। বৃদ্ধত্ব যুবককে, আর তার চোখের চারধারের ব্রীড়ানতা যুবতীদের সেদিন কিরূপে জবুথবু করায়—সে কথা ভাবার আগে মনে জাগে পুরুষের বৃদ্ধত্বকে, কেন না 'পালামৌ'এ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ত জানিয়েই গেছেন—বৃদ্ধেরও এক ধরনের সৌন্দর্য্য আছে যা ঐ বয়সেই প্রকাশ পায়।—কিন্তু নারীর সম্বন্ধে এমন 'এ্যাডেজ্' দিয়ে তাকে অলঙ্কৃত করা চোখে পড়ে নি। সে বৃদ্ধা, পরিচয় সে বুড়ি। আবার কি? এই তার আসল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাবনায় সুন্দর রূপায়ণে তা প্রকাশ পেতে পেরেছে—"আকাশটা সীসার রঙ ধরে আছে। জল হবে না। কেবল সারাদিন একটা বিশ্রী গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। বাতাস বন্ধ। কেমন একটা গুমোট।...এমন দিনে থেকে থেকে হাই ওঠে, ঘুম পায়। অথচ ঘুমুতে গেলে ঘুম আসে না—কেমন যেন একটু তন্দ্রার মত আসে। আর তার সঙ্গে বিবর্ণ বিষণ্ণ এলোমেলো স্বপ্ন। টুকরো টুকরো। বিচ্ছিন্ন একটার আধখানা, আর একটার সিকি অংশ।...যন্ত্রণা হয়, অস্বস্তি জাগে বুকের মধ্যে—আর তখন তন্দ্রা ছুটে যায়। মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—ঘোলাটে আকাশটার মত সারা পৃথিবী যেন বিবর্ণ নীরস ঠেকে। চারিদিকের শব্দ থেমে গেছে, গতি থেমে গেছে। গন্ধ নেই, রঙ নেই।...এমন অবস্থায় মানুষ শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গী খোঁজে, সঙ্গিনী খোঁজে। যেন হতাশ শূন্য মন

আশ্রয়ের জন্য, অবলম্বনের জন্য আর একদিকে হাত বাড়িয়ে এই মন সেই মনকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কেমন আছ, তোমার অবস্থা কি ?...'ভালো না। বুকটা খালি খালি ঠেকছে।"...'আমারও তাই।'...'ঘুমোলে না'...'চেষ্টা করলাম, এলো না—কেবল একটু তন্দ্রার মধ্যে হাবিজাবি স্বপ্ন দেখলাম, ভয় পেলাম, উঠে গেলাম।'...'আমারও তাই হোল। তাই তোমার কাছে চলে এলাম ভাই।'...'দুই বুড়ি'র এমন বিষণ্ণ ছবির নিরালা যন্ত্রণা থেকে তাদের অভাব, অবহেলা, অসম্বলতা যুবককে না ভাবালেও, অন্তত তার যুবতীকে একবার ভাবতে শেখাবে,—সত্যি সেদিন কোথায় থাকবে তার মধুছন্দা মুখশ্রী, পীনোন্নতা যৌবন-রাগ দেহের রেখায় রেখায়, কাজল চোখের দীঘল মায়া, অধরের হাসিতে ঝরা রক্তবরণ গোলাপ-সুরভি, বুকের উদ্ধত লজ্জার বন্দিতা রূপ!—এ গল্পে সব কিছু হারিয়েও বৃদ্ধা তার জগত খুঁজে পেয়েছে এক নিবিষ্টতার মধ্যে মায়াশূন্যতায়।

'বৃষ্টির পরে' গল্পে দুই বন্ধুর বয়েস সীমান্তে হঠাৎ ঝলক দেওয়া মানসিকতার ঝড় থেকে মুক্তির স্বাদ পাওয়া আর নিজেদের যৌবন পরিসরে করা উচ্ছৃঙ্খলতা, আজ বার্দ্ধক্যের শিবিরে পৌঁছে স্মৃতিচারণার মধ্যে দুজনেই দুজনকে ঘাত-প্রতিঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। বন্ধু প্রভাত আজ তার বন্ধুর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে এসেছে, কোন অধিকারে সে তার নিজের আত্মজার সঙ্গে বন্ধুর আত্মজকে অবাধে করতে দিয়েছিল মেলামেশার আলাপচারিতা,—যা একদিন প্রভাতের ছেলে ও বন্ধুর ডায়োসেশনে শিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে যৌবনের জ্বালায় দেহাচারিতায় অন্ধের মত ডুবিয়েছিল! প্রভাতের আত্মজ বন্ধু-কন্যার মধ্যে প্রজায়ণে প্রাণ অঙ্কুরিত করেছিল! কিন্তু কোন অধিকারে বন্ধুর চোখের সামনে থেকে তারই পুত্র আর সেই কন্যার বুদ্ধিতে প্রভাতের ভাবী পৌত্রকে অমন অমানুষিক বর্বরতায়, জন্মমুহূর্তেই মৃত্যু দিয়ে ঢেকে তারা দু জনে অন্তর্হিত হলো কেন? কেন?—আজ এই দাবী নিয়ে ঝানু ব্যারিস্টার প্রভাত তারই আবাল্য বন্ধুকে জেরা করছে। কিন্তু মানুষের মন যে পলকে পলকে, পাল্টায় তারই প্রভাবে প্রভাতকে কিছু আগে দেখা গেছিল তারই সন্তানের রক্তে নিজেকে যে মেয়ে নিশ্চয়ই ভালবেসে নতুন এক প্রাণে পুষ্পবতী হয়েছিল,—হয়ে যে আবার সেই নতুনের আবির্ভাবকে প্রাণশূন্য করাতে দ্বিধা করে নি যৌবন বিলাসে 'মা'-এর রূপকে পুতুল খেলা বলে মনে করে,—সেই মেয়েরই চুলের একটি লাল রীবন হাতে পাওয়ায় প্রভাত

তা পা দিয়ে পিষে দিয়েছিল রাগের আগুনে। কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্তন, সেই—"প্রভাত নীরব। বৃষ্টির জলে স্নান করে করে গাছের রঙ ফেরা দেখছে। উল্লাস দেখছে। যেন একটু পরে সে আমার কথায় ফিরে এলো।…'মানে সারা বসন্তটা ওরা মাঠে খেলাধূলা করল, গ্রীষ্মের শুরু থেকে ওই কামরায় ঢুকল?'…'তাই।'…'আর বর্ষা আসছে এমন সময় তোমার লনেও রইল না ওরা, ছোট্ট ঘরেও রইল না।'…'না।' সংক্ষেপে উত্তর সারলাম। প্রভাতের মুখের দিকে তাকাতে আবার ভয় করে। যেন তার গলার স্বর আবার ভাঙ্গছে টের পাই। 'এসো, ইদিকে—' প্রভাতের হাত ধরে আস্তে টানলাম। 'আমার মাধবীবনের কি চেহারা হয়েছে দেখবে।'…'মাধবী মরবে অপরাজিতা জাগবে।' যেন এই প্রথম একটা কবিতার লাইন বলার চেষ্টা করল প্রভাত। খুশি হয়ে তার হাত ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলি। বৃষ্টির জোর হঠাৎ কমে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। মাথার ওপর পাখার ঝাপটা শুনলাম। একটা পাখি গায়ের জল ঝাড়ছিল। মাধবী বন দেখা শেষ করে আর একটু এগোই দুজন। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রভাত ও আমার দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ওপাশে ঘন কেয়া-ঝোপ। লম্বা ডাঁটার মত সাদা ফুলটা একটু একটু দুলছে। টুপটাপ জল ঝরছে পাপড়ি থেকে। কিন্তু আমরা তা দেখিনি। সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। দেখছিলাম এ পাশটা। জমির একটু অংশ। যেন কাল রাত্রে মাটি খোঁড়া হয়েছিল—রাত্রে বা বিকালে বা কাল সকালে। নতুন মাটির চিহ্ন। গর্ত খুঁড়ে আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির তোড়ে ঘাস সরে গেছে, মাটি ফেটে গেছে। ভিজে মাটি ফুঁড়ে ফুলের কলি আকাশের মেঘ দেখছে।—ভুঁই-চাঁপার কলি। একটা না পাঁচটা, আমরা রুদ্ধশ্বাসে গুনে শেষ করলাম। প্রভাত কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমিও।…মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে প্রভাত ওটাকে টেনে বার করল। আশ্চর্য্য, রাগ করল না সে, কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে না।…'এটা করার দরকার ছিল কি?' প্রভাত আমার চোখ দেখছিল না। মেঘের ফাঁকে রোদ চিকিয়ে উঠছে তাই দেখছিল।…'হয়তো ভয়ে—লজ্জায়।' আমি আস্তে বললাম।…'তারপর পালিয়ে গেল ছুটিতে।' তেমনি আকাশ মুখ করে সোনা গলা রোদ চোখে নিয়ে প্রভাত বলছিল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিলাম। কেবল কি অনুকম্পা? যেন আরো অনেক কিছু দেখলাম প্রভাতের চকচকে চোখ দুটোর মধ্যে। ফুল শুকিয়ে যাওয়ার কথা,—ফুলের

শুঁকিয়ে একটু একটু করে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আমি তাই দেখছিলাম।"

—মানুষের চারধারে কত বিস্ময়, কত রহস্য, কত না বোঝা, না জানা কাহিনী চোখের আড়ালে আড়ালে ঘটে যায়, ঘটে থাকে—তারই অব্যক্ত সুর করুণার জগতে মুঠো ভরা অনুকম্পা হয়ে ঝরেছে "বৃষ্টির পরে" গল্পে। শ্রেষ্ঠ রচনার চিরন্তনী সুরঝঙ্কারে তা মাতোয়ারা।

প্রেম তার চম্পাবরণ রঙে, সোনা ঝরা আবেশ মাদকতায়, আবীর ছোপানো পরাগ রেণুতে, গোরোচনা গোরীর মতন বহুত মিনতিতে, ঋতুসম্ভারে সাজিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শিল্পী মনের সৃষ্টিলগ্নে দোল দেওয়া প্রণয়, প্রীতির মিতাচারিতায়, ছন্দবদ্ধ রাগালাপে, আলাপনের অনুরঞ্জনে, বর্ণনার রাজসীকতায়—আর্টিষ্টিক্ এ্যারিষ্টোক্রেসিতে। ভাষা এখানে মিষ্টি মনের বরবর্ণিকার তনুমনের ছন্দে ভরানো যৌবন-ঝঙ্কৃত সুষমাকে তুলে ধরেছে। এখানে গল্পের পরিপাটি রূপের মধ্যে তিনি আপন প্রেমদর্শনকে ফুটিয়েছেন। এ পর্য্যায়ে মনে স্বপ্নসঞ্চার করে তাঁর লেখা "সমুদ্র" আর "চন্দ্রমল্লিকা"।—দুটি গল্পই প্রণয়-প্রীতির সুধায় মশগুল। একটু আলাদা সুর আছে। প্রেম আগাগোড়া শতদলে রঙবাহার হয় নি "সমুদ্র"তে—কিন্তু "চন্দ্রমল্লিকা"য় শ্রীরাধার হৃদয়-নির্ঝরণের ঝঙ্কারে প্রেমের সোনা রঙ নিকষ রূপ নিয়েছে, 'কামগন্ধ নাহি তায়।'

"সমুদ্র" নামটি রূপঝরার কলতানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমার দিকে, বিরাট অনাবিলতার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ছোট কিছু ভাবা যায় না। সব বিরাট। সব উদার, দিগন্তশূন্য নীল সামীয়ানার ছায়ায়। শ্বেতশুভ্র সফেন তরঙ্গমালায় তার নিঃস্বার্থতা মূর্ত, জাগরূক প্রকটতার মধ্যে। নায়ক আর তার স্ত্রী হেনা ভ্রমণবিলাসে এসেছে সাগরমেখলা পরিবৃত পুরীর বালুচরে।—বালুচর শাড়ীর স্বচ্ছতায় সাজানো কিনা হেনার যুবতী ধরম, তা অন্তত ভাবিয়েছে তার পুরুষকে। সী-বীচে এসে যেদিকে তাকাও-সেখানেই মৃহুলতা ভুলে শব্দলহর তুলে আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছে বিরামহীনা সমুদ্র দুষ্টুমি করে রূপোলী পাড়ের জরিদার ঢেউ-এর পিঠে ঢেউ ছিটিয়ে। ছড়িয়ে। এমন যে শাশ্বত রূপ, যার বিন্দুমাত্র আবিলতা নেই, তারই দর্শনে আর শীতল ছোঁয়ায় মনের কামনা, বাসনা—সব মলিনতাকে ক্ষণেকের ছন্দে, মিলে ভুলে যায়। নায়ক ভুলেছিল। কতকটা বিতরাগ জন্মেছিল তার মনে। কিন্তু চলনে, বলনে হেনা কিন্তু

বদলায় নি। কলকাতার প্রেমবিহ্বলা হেনা এখানে এসেও তার সবুজ যৌবনের হুল্লোড়ে আরো বেশী মেতে পড়ে। সমুদ্র স্নানে তার রুচি নেই। অন্ততঃ সবাই যা পছন্দ করে। নায়ক সাগরবলাকার মুক্ত ভাবনায় মানসবিহার করতে যেয়ে আঘাত পেল—ছিঃ, হেনা কিনা তার দিকে ছুটে আসা ঢেউগুলোর রুপোলী মাথায় আলতা ছোপানো ফর্সা পায়ের আঘাতে ভেঙে দেবার চেষ্টায় ছোট্ট মেয়ের মতন হেসে, গড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে! ভাল লাগল না এ দৃশ্য নায়কের। কোথাকার পাগল সদৃশ, পরোপকারীর ভেকধারী সকলেরই মামা নামে পরিচিত লোকটির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হোল।—বোঝা গেল না কি যে দেখেছিল হেনার স্বামী ঐ বৃদ্ধের মধ্যে,—তবু সে হেনাকে কথায় কথায়, আর চিন্তায় তুচ্ছ করছিল, নারীর স্বার্থপরতাকেই বড় করে দেখছিল, ফতোয়াও দিচ্ছিল নিজেরই স্ত্রীকে—বড় নীচু মন হেনার!—কিন্তু বিস্ময় আরো ঘন হয়ে এলো পুরুষেরই মানসবিহারে, যেখানে তার পক্ষে অনায়াসে প্রাপ্য হয়ে ওঠে হেনার যুবতী দেহের ভরা গাঙে সাঁতার কাটা, তাকে লাজহরা করে একান্ত আপনাতে লীন করা।—কিন্তু সমুদ্র, তাকে আপন ভাবার মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধান, অনেক সাধনা। ও ত নিজেও বুঝেছে, সমুদ্র অনেক দূর। তবু স্ত্রীর সাগরমেখলারঙ শাড়ীতে ঢাকা সুন্দর রূপকে নায়ক সহ্য করতে পারে না। নীল আকাশের ঢল্ খেয়ে লুটিয়ে পড়া সমুদ্রের ধারে বালুচরে দাঁড়িয়ে আঁচল উড়িয়ে, বিনুনী দুলিয়ে, শাড়ী-শায়া জল থেকে বাঁচিয়ে আলতা রঙ পায়ে দুষ্টু মেয়ের নিলাজতা নিয়ে হেনার হুড়োহুড়ি করাটা।—এ রূপ তার চোখে কেবল জ্বালা ধরায়। কিন্তু—"সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোসের মত দেখাচ্ছিল। ও যে মানুষ—কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোন ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা, সমুদ্রতীরের এই ছোট ঘরের বিছানাটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কে বলবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় বুক ভার হয়ে উঠল। যেন আমি নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করলাম। ওই ঘুমন্ত খরগোসের বুকের স্পন্দন দেখতে, হৃদয়ের ধুক ধুক শুনতে আমি কত রাত্রে ওর গাত্রাবাস সরিয়ে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছি। কান পেতে থেকেছি! দেহ-সমুদ্র দেহ-সমুদ্র! আমি তৃপ্ত ছিলাম। চিন্তা করে প্রায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। চোখে জল এলো। সমুদ্র আমার অতীতকে এমন করে তুচ্ছ করে দেবে কে জানতো। ঘুমের ঘোরে হেনা বিড়বিড় করছিল।

ঝামাপুকুরের বাড়িতে আমি তৎক্ষণাৎ আলো জেলে ওর ঠোঁট পরীক্ষা করতাম।—দেখতাম, হাসি জেগেছে, কি কান্নার বাঁকাচোরা রেখা জেগেছে ঠোঁটে। সুখের স্বপ্ন দেখছে, কি দুঃখের! বিছানার কাছে গিয়ে একটা পোকা হাটকাবার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেন নিষ্ক্রিয় কঠিন থেকে শক্ত হাতে জানালার গরাদ চেপে ধরে বাইরে চোখ ফেরালাম। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে। সফেন তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে তীরের দিকে ছুটে আসছে—একটা এল ভাঙ্গল, আবার একটা; আবার, আবার, আবার ...কত কোটি বছর ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এভাবে ছুটে আসছে, গর্জন করছে, হাসছে, ভেঙ্গে গুড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারে।"

—সত্যি নায়ক এখানে সমুদ্রকে ভালবেসেছে। মনের অস্থিরমতিত্বে সে স্ত্রীর আকুতি মিনতি দুষ্টুমিকে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু নায়কের চিন্তাই ঠিক—দেহ-সমুদ্র! হ্যাঁ, যুবতীর প্রিয় দেহদেউলে শত তরঙ্গভঙ্গে বসন্ত তাকে সমুদ্রের মতই অনাবিল, অশেষ রূপে ভরিয়ে তোলে। নারী তাই, পুরুষের তপ্ত, তৃষিতলোকে, ক্লান্তলগ্নে, মিথুন-মুহূর্তে। আনন্দসায়র, আর রূপসাগর—পুরুষ ভুল করলে, লোভ করলে সেখান থেকে পিছলিয়ে যায়।—সাঁতার না জানলে, কুশলী না হোলে সমুদ্রও ত তার শীতল পরশের গহন শৈত্যে ঢাকা পাতালে টেনে ছুঁইয়ে রাখে। আটক রাখে প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পরে একদিন শুধু দেহখানা ভাসিয়ে দেয় ওপরে। তারপর, সত্যি আর প্রশ্ন থাকে না।—হেনাও নায়কের মনের এই সমুদ্রবিলাসের ভ্রান্তিতে উপহাস করতে ছাড়ে নি। হেনা জানতে চেয়েছিল তার পুরুষের কাছ থেকে—'তাকিয়ে কি দেখছ?'...'কিছু না।'... 'নিশ্চয় দেখছ, আমাকে দেখছ।' প্রতিশোধ তুলতে ঠোঁটের হাসি নিভিয়ে হেনা গম্ভীর হয়ে ওঠে: 'তা আমায় দেখে দরকার কি—ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ, সমুদ্র আমার চেয়ে সুন্দর।'...

—মনে হয় সমুদ্র-দর্শনে একটা মায়াবিকার আচ্ছন্ন করেছিল তার স্বামীকে, মনে আস্তে আস্তে রহস্য জড় হচ্ছিল হেনাকে নিয়ে, যা মামা নামে পাগলসদৃশ লোকটির সাক্ষাতে নায়কের মনে বিরাগ আর অনুরাগের দ্বন্দ্ব বাঁধাত। গল্পের শেষে একটা অঘটন ঘটতে পারতো। কিন্তু হোল না প্রিয়া হেনার জন্য, স্ত্রীর ভয়বিহ্বলা কাঁদো কাঁদো কম্পমান অবস্থার জন্য। নায়ক হয় ত ভুল করতে চাইত না, কিন্তু হেনাকে হাত ধরে জলের কিনারে টেনে নিয়ে স্নান করাবার জন্য পীড়াপিড়ি আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তার স্বামীর কাছে

দেখা দিয়েছিল সেই মামা নামে লোকটি—যার সম্বন্ধে হেনা জানতে পেরেছে, নিজের স্ত্রীকে নাকি লোকটা সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। কী নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর! হেনা তার স্বামীকে খুবই ভালবাসত। আর তাই সে সুখের নীড় যাতে এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে না যায়, তারই জন্য সমুদ্র-স্নানে স্বামীর সহযোগীতা পাওয়া সত্বেও সঙ্গে যেতে রাজী নয়। দিনমানে বেশীর ভাগই সে লক্ষ্য করেছিল, স্বামী ঐ লোকটার সঙ্গে ওঠা বসা আরম্ভ করেছে। ফলে লোকটার স্ত্রীহন্তা রূপ তার স্বামীর মধ্যেও না জানি অলক্ষ্যে ছায়া ফেলে যাবে! আর এ ভাবেই প্রেমের দ্বন্দ্ব আরো জোরালো হোয়েছিল দু'জনকার মধ্যে।—তবু বলব, লেখকের সুন্দর জবানবন্দীতে নায়কের চিন্তা তার প্রিয়া হেনার জন্য প্রীতির গাঢ় রঙকেই মুখর করে জানিয়েছে—"…সামনে ফেনশীর্ষ লক্ষ লক্ষ ঢেউ, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে উত্তপ্ত প্রখর ঝকঝকে বালুরাশি —আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না; কেবল একজন—একটি মূর্তি। বেনীটা দুলছে। শরতের এক টুকরো সাদা মেঘ হয়ে আঁচলটা উড়ছে। কি, একবার মনে হল সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগণ্য নির্জন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না— মানান উচিত না।…হেনা খিল খিল করে হাসছে। এত বড় একটা ফেনার ঝলক ওর পায়ের কাছে ছুটে আসে, আলতা পরা পায়ের পাতা ভিজে যায়। যেন ইচ্ছা করে ফেনার দুধে ও পা ডুবিয়ে রাখছে। আজ অন্যরকম। ঝিনুক কুড়োতে মন নেই, জলের স্পর্শে ওর বুঝি রোমাঞ্চ জাগছে; অসহ্য পুলকে হেনা হাসছে। ভাল লাগল দেখে। আমার মনে পড়ে না, প্রথম রাত্রে আমার স্পর্শ—পুরুষ-স্পর্শ এত আনন্দ দিতে পেরেছিল তাকে। শায়াশাড়ি কুঁচকে দলা করে হাঁটুর কাছে তুলে ধরেছে ও। নিটোল সুবাসিত সোনার রঙের পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে পড়ে না, এখন বালির বিছানায়, ঢেউয়ের মুখে ওর পা দুটো যেমন সুকুমার লোভনীয় চেহারা ধরেছে আমাদের ঘরের বিছানায়, তার হাজার ভাগের এক ভাগ সুশ্রী লাবণ্য-যুক্ত মনে হয়েছে কোনদিন! মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।…'আর একটু—আর এক পা এগিয়ে যাও।'… ভয়ে চোখ বোজে ও।…'ঢেউ এখানে আসছে নাকি।' ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দেই।"…

শুধু অনাবিলতা আর স্বার্থহীনতার পরিচয়ে উত্তাল হোয়ে ওঠে সমুদ্রের পার-ভাঙা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে যাওয়া গুরু-গম্ভীর কলোচ্ছল ছবিখানা। ওর ব্যাপক উদার ভাব আর আত্মভোলা ও ধ্যানমৌন বিরাটত্ব—সত্যি সাধারণ কামনা আর বাসনা জড়ানো মানুষের কাছে একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরের বিষয়। তবু বলব, "সমুদ্র" নামকরণের রূপকটুকুর ভেতর দিয়ে এর শিল্পী এক অভাবনীয় মনসমীক্ষার সার্থক নিরীক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।—যার ভাবলোক আলোড়নের রূপমদির করা ঝলক মেখে উঠেছিল এক আধুনিক দম্পতির বড় বেশী নির্লাজ হওয়া দেহসচেতনতার আড়ালে, আবডালে। দেহবাসরের মধুমাস চেসে খেলে বসন্তের জোয়ারে যুবতী স্ত্রী হেনার মধ্যে একদিন সত্যি খুঁজে পায় তার স্বামী—নিজের পুরুষ স্বভাবের অবচেতন মানসিকতায় জাগা সমুদ্র-প্রিয়তার আতিশয্যকে। সত্যি, যুবকের এই চিন্তার শেষ চমক তাকে বোঝাতে পেরেছিল বোধের প্রতিটি অণুতে ঘিরে—প্রিয়া স্ত্রী রূপে সুস্মিতা হেনার যৌবন-তনুখানাই হলো রূপে-অরূপে মায়াভরা দেহসমুদ্র! তাই "সমুদ্র" গল্প দু ধারাতেই—গল্প ও তার গল্পকার—উভয়ের জন্যই সাহিত্য রূপে চরম সার্থকতারই বুনোন কোরেছে।—এ গল্পেরই রেশ ধরে আমরা বলতে পারি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রোমান্টিক সৃষ্টির অনিন্দ্য রূপায়ণ রূপে "চন্দ্রমল্লিকা"র বিষয়টি অতি আধুনিক চিন্তার জটিল আর ধোঁয়াটে পরিস্থিতিতেও কত সূক্ষ্ম ও সেই সঙ্গে আর্টিস্টিক বীক্ষায় যৌবনের মৌ-কথায় দেহের ধেয়ানে বাসর সাজানো না দেখিয়েও, কোরে তুলেছে যৌবনাচারের অমূল্য মূল্যায়ণ। বাস্তবনিষ্ঠ রোমান্টিক শিল্পী রূপে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর নিজস্ব জীবনভাষ্যের দ্যুতিময়তায় আজও এ কথা ভুলতে না দিয়ে প্রমাণ করাতে পেরেছেন যে—অতি নিষ্ঠার সুন্দর বিকাশ বিনতা ও তার প্রিয়র সম্পর্ককে সহজ-মধুর কোরে তুলেছিল "Purification of love"—বা ভালোবাসাবাসির শুদ্ধিকরণ কাজেতে যৌবনের দুই দোসরকে দেহ থেকে মনের সুস্নিগ্ধ ঘরেতে টেনে নিয়ে ভালর সঙ্গে ভালর দ্বন্দ্বকে মিতালিমধুরই কোরে। এ দ্বন্দ্বের যে অবসান নেই। নিরবধি কাল চলতে থাকে এর টানা-পোড়েনের এ-দিক আর সে-দিক।—আমাদের ভুললে চলবে না ক্ল্যাসিক রীতির "বারোঘর এক উঠোনে"র সুরুচি আর "মীরার দুপুরে"র মীরাকে! কেন না, ওদের নারী জীবনের যুবতী ধর্মকে ঘিরেই বাস্তব আর অবাস্তবের সংঘর্ষ নিয়ে যৌবনের পুরুষকে ধন্য কোরে সে সব কাহিনী প্রখর কল্পনাশক্তির ধ্যানে সার্থক রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করাতে পেরেছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আর তাঁর গল্পকার পরিচয়ের রূপনিষ্ঠ মনীষায়।

(ক [illegible] চিন্ত।)

রংচং

হঠাৎ সেদিন কুমারেশের সঙ্গে দেখা।

মহালয়ার ছুটির দিন।

রৌদ্রোজ্জ্বল সুন্দর আকাশের এখানে-ওখানে পক্ষবিস্তার ক'রে ছিল শাদা শাদা মেঘ।

আর আকাশ থেকে যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল নীল দ্যুতিময় আভা নিচে রাস্তায়, রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর ওপর, একটা শিশু দেবদারুর মাথায়, অদূরে দাঁড়ানো কার বেবি অস্টিনের হুডের গায়ে।

পেভ্‌মেণ্টের এ পাশে দেবদারুর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল ওদের রিকৃশ।

পূজোর দীর্ঘ ছুটি আরম্ভ হওয়ার আগে হাল্কা একটা ছুটি কাজের মানুষ দুটোকে বেশ উল্লসিত, উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে, তা কুমারেশের মুখের দিকে, বেশভূষার দিকে, তার স্ত্রী ডলি মিত্তিরের হাসি, বেশভূষা ও চাহনির দিকে তাকিয়ে অনুভব করলাম। ঢোক গিলে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় চললে?'

'মার্কেটিং।' বলল কুমারেশ। তারপর পার্শ্বে উপবিষ্টা অর্ধাঙ্গিনী ডলিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল। "ডলি, শ্রীমতী ডলি মিত্তির। আমার স্ত্রী।'

হেসে বললাম, 'দেখেই বুঝেছি। তারপর?'

কুমারেশের গলার স্বর তেমনি তীব্র, ধারালো, দরাজ আছে লক্ষ্য করলাম।

'আমার বন্ধু, মাধব—মাধব সোম। ব্রিলিঅ্যান্ট স্কলার, ভয়ানক ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল লোক।' স্ত্রীর নিকট বন্ধুর পরিচয় দিয়ে কুমারেশ হাসতে লাগল, হাঁপাতে লাগল।

আয়ত সুন্দর চোখ মেলে ডলি এবার আমাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখল।

'তারপর তোমার খবর কি?'

'এই, কাটছে কোনোরকম।' বললাম কুমারেশের মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে। 'কতকাল পরে দেখা!'

কিন্তু কুমারেশ সেকথার উত্তর দেয় নি। অপাঙ্গে চট্‌ ক'রে স্ত্রীকে একবার দেখে সে আগের চেয়েও জোরালো লম্বা গলায় হাসল। 'মহিষীর হুকুম। ছুটির দুপুরটা শাড়ি-গয়নার দোকানে কাটবে, ভায়া।'

'এই চুপ!' ডলি চোখ পাকিয়ে স্বামীর দিকে তাকায়।

কিন্তু কুমারেশের তাতে গ্রাহ্য নেই, হাসে। 'ট্যাক্সি করলে রাস্তার দু'ধারের দোকান তো দেখা হয় না, তাই রিক্‌শ। কেমন না?' আমার দিকে এবং পরমুহূর্তে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কুমারেশ মিটিমিটি হাসে।

যেন লজ্জিত, আহত হ'য়ে ডলি মুখ নামাল।

বললাম, 'আচ্ছা বেশ, তোমরা জিনিসপত্তর কেনাকাটা করো, চলি—'

'ইউ স্কাউণ্ড্রেল!' কুমারেশ ভয়ানক জোরে ধমক দিয়ে উঠল। 'চলি মানে? কি এমন কাজের তাড়া তোমার ছুটির দিন? সঙ্গে এসো।' রিক্‌শ থেকে লাফিয়ে নেমে কুমারেশ আমার হাত ধরল।

'মন্দ কি, চলুন।' ডলির এই প্রথম খুশি-গলা শুনলাম। 'ওর না আছে জানাশোনা ভালো দোকান, না জানে কিছু দরদস্তুর করতে।' রিক্‌শ থেকে মহিষী নামল।

'আমারই কি দাম-টাম তেমন জানা আছে! না, জানাশোনা দোকান!' আমতা-আমতা করছিলাম। কিন্তু স্বামীস্ত্রী দু'জনের একজনও সেকথায় কর্ণপাত করল না।

'আগে তুমি আমায় সরবতের দোকানে নিয়ে চলো।' ডলি স্বামীকে হুকুম করল। 'তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

'এই তো চা খেলে!' কুমারেশ কেমন ভাঙা গলায় হাসল। 'এর মধ্যেই তেষ্টা পেল!'

'উঃ, কি তোমার চা!' ডলি বলল, 'তা-ও তো হাজার বার বলার পর একটা বাজে রেস্টুরেন্টে নিয়ে ঢোকালে।'

কুমারেশ কথা কইল না।

এবং দেখা গেল, হাজারবার নয়, ডলি একবার হুকুম করতে ওর হাত ধ'রে কুমারেশ পেভ্‌মেন্টের ওপর, বলতে গেলে প্রায় একটা প্রথম শ্রেণীর সরবতের দোকানে গিয়ে ঢুকল। পশ্চাতে আমি।

'এখানে এসে কেন বসলুম, জানো?'

'কেন?' সরবতের গ্লাসের ওপর ডলির সুন্দর চোখ, বঙ্কিম ভ্রূযুগল জেগেছিল। যেন তন্ময় হ'য়ে কুমারেশ তা দেখতে দেখতে হাসি-গলায় প্রশ্ন করল, 'কেন, কেন হঠাৎ তোমার সরবত খেতে ইচ্ছে হ'ল শুনি?'

'ঐ দেখো।' আঙুল দিয়ে ডলি উল্টোদিকের ফুটপাথের একটা দোকান দেখাল।

কুমারেশ সেদিকে তাকায়, আমিও তাকাই। শ্বেতপাথরের জিনিস। থালা, গ্লাস, হরিণ, পাখি, তাজমহল, পিরামিড সাজিয়ে রেখেছে।

'কতকাল আমার এক সেট্ পাথরের জিনিস কেনার ইচ্ছে।'

'আমি তো বারণ করছি না! কেনো-না তুমি!' কুমারেশ স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকায়।

ডলি চোখ বুজে আর এক ঢোক সরবত গিলল। একটু সময়ের স্তব্ধতা।

না, সরবত পান করতে করতে আমি ওদের কথা ভাবছিলাম না, ভাবছিলাম নিজের কথা।

ছুটির দিন পূজোর বাজারে সওদা করতে বেরিয়েছে কুমারেশ, তার স্ত্রী।

বন্ধু-বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দোকানে দোকানে ঘুরে ওদের এটা-ওটা দরদস্তুর, কেনাকাটা করায় সাহায্য করব ভয়ে আমি যে ক্লান্ত বা বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছিলাম, তা নয়। বরং কোনো কিছু কেনাকাটা, দরদস্তুর না ক'রে উদ্দেশ্যহীনের মত কেবলই রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তখন এদের দেখা পেয়ে মনে মনে বেশ খুশিই হলাম।

কিন্তু ওদের মধ্যে যেন কি হ'ল।

সরবতের গ্লাসটা হাত থেকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ডলি।

'থাক্‌গে, পাথরের জিনিস আজ কিনব না।'

'কেন ?' কুমারেশ ঢোক গিলল। উদ্বিগ্ন গলার স্বর।

ডলি স্বামীর চোখে চোখে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকায়। ঠোঁটে অল্প হাসি। 'হাজারবার তো ব'লে নিই! তারপর একদিন রাজি হ'য়ো, এসে এক সেট্‌ থালা-গ্লাস-বাটি কিনে নেওয়া যাবে।'

কুমারেশ কথা বলল না।

সরবত খাওয়া শেষ ক'রে তিনজন রাস্তায় নামলাম।

ডলি বলল, 'জুতোর দোকানে ঢুকবে কি আগে ?'

'তোমার ইচ্ছে।' কুমারেশ গলা পরিষ্কার করল। 'শাড়ির দোকানও কাছেই।'

ডলি আবার আমার দিকে তাকায়। বাঁ হাতের রুমাল

দিয়ে ও চিবুকের নিচেটা মোছে। কুমারেশ দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়।

বললাম, 'গয়নার দোকানও কাছেই।'

'তবে সেখানেই আগে যাওয়া যাক।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কুমারেশ প্রস্তাব করে।

ডলি খুশি হ'য়ে ঘাড় নাড়ল। আর কৃতজ্ঞতা-অভিনন্দন জানিয়ে আমায় আর একটি সুন্দর চাহনি উপহার দিলে ও।

কুমারেশ তো খুশিই।

তিনজন কলরব করতে করতে 'হীরকভাণ্ডারে' প্রবেশ করলাম। কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত জুয়েলার্স শপ্।

আমার ওপর গয়না পছন্দ এবং সেটার দাম ঠিক করার ভার গছিয়ে কুমারেশ একটা চেয়ারে চুপচাপ ব'সে রইল। সিগারেট পুড়ল।

ডলিকে নিয়ে আমি শো-কেসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

এত কাছাকাছি হয়েছি দু'জন যে, ওর চুলের সুঘ্রাণ, দেহের সৌরভ মাঝে মাঝে আমার নাকে এসে লেগেছে। আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছি পরস্ত্রীর ঘন সান্নিধ্যে।

তারপর ডলি একসময় সোজা চ'লে গেল কুমারেশের পাশে। দোকানের দরজায় সে চুপচাপ চেয়ারে ব'সে সিগারেট টানছিল।

'একটাও পছন্দ হ'ল না?' কুমারেশ এক ধরনে হাসল।

ডলি মাথা নাড়ল।

'তবে চলো আর একটা দোকানে।' কুমারেশ সোলার টুপি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

হাতের রুমালটা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ডলি বলল, 'সোনাদানা হাজারটা দোকানে না ঘুরলে, হাজাররকম ডিজাইন না দেখলে কিচ্ছু পছন্দ করা যায় না।'

ডলি ঠাট্টা করল, কি গম্ভীরভাবে কথা বলল, ঠিক ধরতে না পেরে যেন শূন্য দৃষ্টিতে একটুক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে কুমারেশ বলল, 'চলো।'

কিন্তু রাস্তায় নামতে ডলির সুর বদলায়। 'থাক আজ। যেদিন পাথরের বাটি কিনব, সেদিন নয় গয়নাও কেনা যাবে।'

'তবে কি এখন শাড়ির দোকানে ঢুকবে?' অল্প অল্প হাসে কুমারেশ।

'আগে তো টফি খাওয়াও।' পাশের একটা দোকানের শো-কেসে কাচের বয়মের ভেতর রঙিন প্যাকেট-মোড়া চকোলেট-লজেন্স দেখে ডলি থমকে দাঁড়ায়। 'গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে আবার।'

'নিশ্চয় খাওয়াবো টফি।' অমিত উৎসাহে কুমারেশ চকোলেট কিনতে অগ্রসর হয়।

ডলি আমার চোখে চোখ রেখে নীরবে হাসে।

'হাজারবার কিন্তু বলতে হ'ল না', বললাম আমি, 'মুখ থেকে একবার বের করেছেন কি, কুমারেশ ছুটে গেছে চকোলেট কিনতে।'

ডলি একথার ওপর কোনো মন্তব্য করে নি।

কুমারেশ ফিরে এল।

গালে চকোলেট পুরে ডলি বলল, 'চলুন, কোথায় আপনার শাড়ির দোকান।'

বললাম, 'ঐ তো সামনে।'

আশ্চর্য, একটা শাড়িও ওর পছন্দ হ'ল না।

বললাম, 'আর একটা দোকান দেখবেন কি?'

একটা লজেন্স মুখে পুরে ডলি মাথা নাড়ল, 'দরকার নেই। বাজারে মনের মত কাপড় আমদানি হয় নি, হ'লে ওরা রাখত। দোকানটা তো আর খুব ছোট নয়!'

বললাম, 'তাও বটে।'

'তাই ভাল।' হাল্কা গলায় কুমারেশ বলল, 'দু-চারদিন পরে বরং—'

'শাড়ি-গয়না একসঙ্গে কেনা যাবে।' স্বামীর অর্ধসমাপ্ত বাক্য পূরণ ক'রে ডলি রাস্তায় পা বাড়ায়। আমরাও।

কুমারেশ রাস্তার ধারে কচি ডাবের দোকান দেখে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল।

'তোমার ডাব কত ক'রে হে!'

'চার আনা।'

'বড়গুলো?'

'ছ আনা।'

'আমাকে একটা বড় ডাব কেটে দাও।' কুমারেশ ডলির দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ায়। 'একটা ডাব খাও, ডাব খেলে তোমার পিপাসা আর থাকবে না।'

'লক্ষ্মী ছেলেটি হয়েছ আজ। না চাইতেই সব কিনে কিনে খাওয়াচ্ছ।' ডলি কাটা ডাব মুখের কাছে তুলে অপাঙ্গে আমাকে দেখে।

কুমারেশ নতুন সিগারেট ধরায়।

'জুতোর দোকানে?' কুমারেশ প্রশ্ন করে।

'দরকার নেই, ঐ একদিনেই সব হবে।' লক্ষ্মী মেয়ের মত ডলি রুমাল দিয়ে ঠোঁট ও থুঁতনিতে লেগে-থাকা ডাবের জল মুছল।

যেন বিজয়গর্বে এবার কুমারেশ আমার মুখের দিকে তাকাল।

'এবার কি ঘরে ফিরবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

স্বামীস্ত্রী যুগপৎ আমার দিকে মুখ ফেরাল। 'কেন, আপনার কি কোথাও যাবার তাড়া আছে নাকি?'

'কারো সঙ্গে এন্‌গেজমেন্ট ?' কুমারেশ খোঁচা দেয়।

'বৌয়ের কোনো ফরমাস ?' তার বৌ প্রশ্ন করে।

'একটু বেড়াচ্ছি, আয়-না সঙ্গে।' কুমারেশ আমার হাত ধ'রে বলল, 'চল, ঐ পার্কে গিয়ে একটু বসি।'

'হুঁ, চলুন।' ডলি বলল, 'বুঝতে পারছেন না, তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলে এখুনি দাম্পত্য কলহ শুরু হবে! একটা জিনিস কিনতে পারলাম না।'

'সে দোষ তো আপনার। আপনারই কিছু পছন্দ হ'ল না।' হেসে মন্তব্য করলাম।

কথার শেষে কুমারেশের চেহারা দেখলাম। কুমারেশ মাথার ওপর ট্রামের তার দেখছিল।

'তোমার সবসুদ্ধ কত খরচ হ'ল? ডাব, টফি, চা, সরবত নিয়ে?' হঠাৎ ডলি স্বামীকে প্রশ্ন করল। তখন আমরা পার্কের কাছে এসে গেছি। কুমারেশের দিকে তেরছা চোখে ডলি তাকিয়ে।

'এক টাকা ন আনা।' গম্ভীর গলায় কুমারেশ উত্তর দিলে। ডলি আর শব্দ করল না।

পার্কে ঢুকে তিনজন পাশাপাশি একটা চেয়ারে বসি। আতাগাছের ঘন ছায়ায় জায়গাটা ঠাণ্ডা। আকাশের শাদা মেঘগুলো ছেঁড়া তুলোর মত হ'য়ে গেছে হাওয়ায়। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ থম্‌থমে গলার শব্দে চমকে উঠি।

'আমার কাছে ভাঙতি ন আনা নেই, সব আস্ত টাকা। বাড়ি গিয়ে তোমায় এক টাকা ন আনা দিয়ে দেব।'

'তা দিও, অত তাড়া কি। একসময় দিয়ে দিলেই হবে।' মিন্‌মিনে গলায় বলল কুমারেশ, আর জুতোর তলা দিয়ে পায়ের নিচের কতকগুলো ঘাস ছিঁড়ে ফেলল।

'না, যখন তখন।' সরু গলায় ডলি কথা কয়। 'সঙ্গে সঙ্গে এসব দিয়ে দেওয়া ভালো। পরে আর মনে-টনে থাকে না।'

নিশ্চুপ, নত মুখে কুমারেশ ছেঁড়া ঘাসের ডগাগুলো দেখলে, লক্ষ্য করলাম।

চুপ ক'রে থাকি।

একটা পাখি মাথার ওপর গান গাইছিল। যেন কি এক অস্বস্তিতে ডলি উঠে দাঁড়াল। 'না, এখনি ভালো। তোমার তো সিগারেট ফুরিয়েছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে টাকা ভাঙাব। এক টাকা তিন আনা তুমি পাচ্ছ। দাঁড়াও।'

ব'লে ডলি আর অপেক্ষা করল না, সিগারেট কিনতে চলে গেল।

'কি ব্যাপার?'

বন্ধুর চোখের দিকে তাকাই।

'ঐ হচ্ছে, মাঝে মাঝে ওরকম করছে আজকাল।' কুমারেশ হাসল। 'ও এখন চাকরি করছে কি না!'

চোখ বড় করলাম আমি।

'তা হলে তোমার টাকায় শাড়ি, গয়না, জুতোও কিনবে না শেষ পর্যন্ত, এই মতলব? কি বলো? আত্মসম্মানবোধ?'

'তা হবে, হ'তে পারে।' কুমারেশ ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

ডলি ফিরে এল সিগারেট নিয়ে।

'এই তোমার পয়সা, সিগারেট।'

'তোমরা ততক্ষণ গল্প করো দু'জন।' কুমারেশ উঠে দাঁড়াল। 'আমি একটু পায়চারি করব।'

ব'লে আর কথা না ক'য়ে সোজা চ'লে গেল সে দূরে অন্য গাছের ছায়ায়।

ডলি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল একসময়। বললাম, 'কি ব্যাপার ?'

ডলি মৃদু হাসল। 'ওই হচ্ছে, ঐ করছে আজকাল।'

'কেন ?'

'চাকরি নেই।'

'কিন্তু—' ঢোক গিলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম, কথাটা জিজ্ঞেস করার আগে। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'কিন্তু বেশ তো খরচ করলো তখন কুমারেশ আপনার সরবত, ডাব, চা-টা বাবদ —পোশাক-পরিচ্ছদও ওর খারাপ না। আমি আরো ভাবলাম, ভাবছিলাম—'

'পোশাক-পরিচ্ছদ আমার দেওয়া।' নিষ্কম্প সহজ গলায় ডলি বলল, 'পাঁচ টাকা ধার ক'রে এনেছে কাল কারো কাছ থেকে। তাই খরচ করছে, তাই দিয়ে ও আমার—' ডলি থেমে গেল।

পাখিটা জোরে কিচিরমিচির ক'রে উঠল মাথার ওপর।

কুমারেশ ফিরে এসেছে।

বলল, 'চলো, ওঠা যাক।'

'বাড়ি ফিরতে এখন ট্যাক্সি ডাকবে নাকি, না সেই রিক্‌শ ?' ব'লে ডলি একপলক স্বামীর দিকে, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে সুন্দর বাঁকা ঠোঁটে হাসল।

যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে কুমারেশ আমার দিকে চোখ ঘোরাতে চোখটা আমি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিই।

রাস্তায় নেমে ওরা পরে ট্যাক্সি কি রিক্‌শ ডেকেছিল, জানি না। তবে পার্কের গেট পার হবার সময় দেখি, অদূরে আইস্‌ক্রিমের গাড়ি এসে গেছে।

'কি, খাবে নাকি একটা ম্যাগ্‌নোলিয়া ? বলো, ডাকব ? একটা বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া খেলে তোমার শরীর জুড়িয়ে যাবে।'

স্ত্রীর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে কুমারেশ পরে আমায়ও একপলক দেখল।

আকাশের দিকে মুখ তুলে ডলি মৃদু গুঞ্জন করার মতন শব্দ ক'রে বলল, 'ডাকতে পারো, ডাকো।'

আশ্চর্য, এবার কিন্তু ও আর আমার মুখের দিকে তাকাল না। না কি, ওর কথা শুনতে পাই নি ব'লে ডলি মনে করেছিল। ওরা চলে যাবার পরও ভাবলাম।

সার্কাস

সেবার শীতের গোড়াতেই প্রোফেসার রামগতির সার্কাস এসে গেল। আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরে সার্কাসের দল আসার অর্থ কি তা বড়রা না জানুক আমরা বেশ ভাল করে জানতাম। মানে আমরা ছেলে-ছোকরার দল আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে সারাক্ষণ সার্কাসের দলের বাঘের পিঁজরা, ভল্লুকের পিঁজরা, বানরের পিঁজরা, ঘোড়ার আর ছাগলের তাঁবু দেখতে দেখতে সকাল-দুপুর-বিকেল কাটিয়ে দিয়েছি। সেবার সার্কাসের তাঁবু পড়বি তো পড় একেবারে আমাদের স্কুলের লাগোয়া মাঠে পড়ল। কাজেই আমাদের মনের অবস্থা কি দাঁড়াল কল্পনা করুন। তাঁবু খাটাবার বড় বড় খুঁটি, বাঁশ দড়ি ত্রিপল, তাঁবু ঘেরাও করার কাঁটাতার, লোহার রড, মাঠের ঘাস দলাই-মলাই করে জমি মিহি করার রোলারটা পর্যন্ত যেন আমাদের আপন জিনিস হয়ে উঠল। বইখাতা বগলে নিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেলা দশটা পর্যন্ত সব দেখলাম। তারপর পড়ল স্কুলের ঘণ্টা। বড় খারাপ লাগল কানে শব্দটা। তার চেয়ে ওই যে হৈ হৈ করে ওরা দড়ি খাটাবার খুঁটি পুঁতছে, বাঁশ কাটছে, রোলারটা টেনে-টেনে ওদিক থেকে অন্যদিকে ঘোরাচ্ছে সেসব শব্দ আমাদের কাছে অনেক বেশি মধুর লাগছিল। কি, ক্লাসে বসেও আমরা কান খাড়া করে রেখেছি তাঁবুর খুঁটি পোঁতার শব্দগুলো শোনা যায় কিনা। ইংরেজী অঙ্ক ইতিহাস ভূগোলের একটি শব্দ মাথায় ছিল না মনে থাকত না। সব কিছুর জায়গা জুড়ে ছিল একটা কথা। সার্কাস।

টিফিনের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিলপিল করে আবার সব ছুটে গেছি মাঠে। হয়ে গেছে, তাঁবু খাটানো এর মধ্যে হয়ে গেল! যেন মাঠ-জোড়া অতবড় ছাউনি দেখে আমাদের চোখের পলক পড়ছিল না, ফ্যালফ্যাল করে সবাই চেয়ে দেখছি। মাঠটাকে আর চেনা যায় না। অসহ্য আনন্দ অপার বিস্ময় বুকে নিয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়লাম। তখনো সেখানে কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, গ্যালারীর বড় বড় ফ্রেম আর তক্তা বোঝাই হয়ে গরুর গাড়িগুলো একেবারে তাঁবুর তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেশুনে আমরা তাঁবুর ওধারে চলে গেলাম। এপার থেকে কিছুই বোঝা যায়নি, তাঁবুর ওপারে আমরা যেন আর এক জগতে গিয়ে পড়লাম। এক দু তিন চার—গুণে গুণে দেখলাম উনিশটা ছোট ছোট তাঁবু সার করে খাটানো হয়েছে। যুদ্ধ করতে গিয়ে সৈন্যরা নদীর ধারে বনের পাশে তাঁবু খাটায়। হ্যাঁ, সেদিন থেকে আমাদের কাজ হ'ল প্রত্যেকটা তাঁবুর ভিতর উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখা। 'এই হঠ্ যাও হঠ্ যাও বাচ্চা আদমী সব'—খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট পরা, কি পায়জামা পরা, কি লুঙ্গি পরা, সার্কাসের দলের এক এক জন আমাদের মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা কি তা গ্রাহ্য করি। ওই ওটার মধ্যে বাঘের খাঁচা। একটা দুটো তিনটে। তিনটে বাঘ। একটা বুড়ো হয়ে গেছে। একটা বাচ্চা। আর একটা ভীষণ যোয়ান। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! গায়ের কী রং চোখের কী জ্যোতি! বাঘ দেখা শেষ করে ভল্লুকের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কালো ঝুপঝুপ লোমে ঢাকা ভল্লুক মশাই আমাদের দিকে পিটপিট করে তাকায়। খাঁচার মধ্যে আটকা থেকে থেকে ভল্লুকের মেজাজ যে কতখানি রুক্ষ হয়ে গেছে তাই আমাদের দেখবার বিষয়। ভল্লুকের খাঁচা পার হয়ে বানরের খাঁচার সামনে গিয়ে পড়ি। বানরের সামনে সবচেয়ে সুবোধ শান্ত ছেলেটিও যে বড় অশান্ত দুষ্ট হয়ে গেছে তা আপনাদের অজানা নেই। বাঁদরামির চূড়ান্ত করে এবং লুঙ্গি পরা

ঝাঁকড়া চুলওয়ালা সার্কাসের দলের লোকের ধমক খেয়ে পরে সেখান থেকে সরে পড়ি। ছাগল আর গাধা। ছাগল দিয়ে কি হয়। ছাগলের দুধ খায় সার্কাসের দলের লোকেরা। ছাগলের দুধ গরুর দুধের চেয়ে বলকারক। আমরা বলাবলি করি। তাই না হলে ছাগল আবার কি খেলা দেখাবে। গাধা? এক দুই তিন—সাতটা গাধা। গাধা কি খেলা দেখাবে? কে জানে, হয়তো—ভাবতে ভাবতে গাধার সামনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করাটা কিছু না চিন্তা করে বেশ বড়মতন একটা তাঁবুর সামনে চলে যাই। ঘোড়া। হ্যাঁ, স্কুলে আসার পথে ওবেলা প্রোফেসার রামগতির দি গেট এশিয়ান সার্কাসের পোস্টার আমাদের চোখে পড়েছিল। আর তাতে দেখেছিলাম আটটা ঘোড়া আটটা চাকার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা চাকা দিয়ে আগুনের শিখা লকলক করছে। এক দু তিন—বুকটা একটু দমে গেল। আটটা তো নেই। সবশুদ্ধ ছ'টা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তিনটার রং লাল, দুটো সাদা আর লালে মেশানো, একটা কুচকুচে কালো। তবে যে পোস্টারে আটটা ঘোড়া দেখলাম। 'রাস্তায় দুটো মরে গেছে', কে একটা ছেলে বলল। কিন্তু তার কথায় আমরা বিশ্বাস করতে পারলাম না। আর দুটো ঘোড়ার কি হ'ল? কাকে জিজ্ঞেস করা যায়,—'সার্কাসের ঘোড়া অত সহজে মরে নাকি।' আমরা বলাবলি করলাম। ওরা তো আর গাড়ি টানে না। কত যত্ন! দেখলাম প্রত্যেকটা ঘোড়ার সামনে মাটিতে বড় বড় কাঠের গামলায় ছোলা ঢালছে একটা লোক। জলে ভিজে টুসটুসে হয়ে আছে ছোলা। 'এই, এই শোন—' 'ওধর মৎ যাও!' চমকে ঘাড় ফেরাই। লাল চোখ, মাথায় সোলার টুপী খাকি হাফ-প্যাণ্ট জুতো-মোজা পরা লোকটা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে উঠল। বাকি ঘোড়া দুটোর কি হল আর জানা হল না। মন খারাপ করে আমরা ঘোড়ার তাঁবু পার হয়ে যাই। হাতী, হাতী। ছোট তাঁবুর

মধ্যে তো আর হাতী ধরে না, তাঁবুর সারির পিছনের একটা ফাঁকা জায়গায় লোহার শিকলে বাঁধা প্রকাণ্ড হাতী দুটো দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু ভাল করে দেখবার আগেই স্কুলের ঘণ্টা পড়ল। অর্থাৎ টিফিনের ছুটি ফুরোল। কাজেই তখনকার মতন মাঠ ছেড়ে উঠে আসতে হল।

স্কুলের ছুটির পর বিকেলে আমাদের প্রথম কাজ হল হাতী দুটোর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। প্রোফেসার রামগতির ওটাই সেরা খেলা। বুকে হাতী তোলা। পোস্টারের ছবিতে দেখেছিলাম রামগতি শুয়ে আছে। রামগতির বুকের ওপর একটা বড় তক্তা বিছানো। আর তক্তার ওপর হাতী দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়ছে। না না, ছবিতে আর একটা জিনিস ছিল। হাতীর পিঠে রঙচঙা একটা গদীর ওপর ফুটফুটে একটি মেয়ে বসে আছে। ভারি সুন্দর চেহারা মেয়েটির। গদীর ওপর বসে মেয়েটি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্যালুট করছে। আঁটসাট গড়ন। কানে নাকে ফুল। পিঠে লম্বা বেণী ঝুলছে। বেণীর মাথায় একটা সাদা ফুলের তোড়া বাঁধা। সেই হাতীর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা জল্পনা করতে লাগলাম প্রোফেসার রামগতি দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বুকে নেয়। আস্ত আস্ত কলাগাছ কেটে দেওয়া হয়েছে। হাতী দুটো পায়ের নখ দিয়ে শুঁড় দিয়ে গাছগুলো ফড়ফড় করে ছিঁড়ে মুখে তুলছে আর চিবোচ্ছে। মুখ থেকে লালা ঝরছে, সাদা সাদা ফেনা গড়াচ্ছে। যেন খেতে খেতে গরম লাগছে বলে কুলোর মতন প্রকাণ্ড কান দুটো নেড়ে হাওয়া লাগাচ্ছে গায়ে। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কত মোটা চারটে পা। কত বড় শরীর। 'একটা হাতীর ওজন কয়েক শ মণ হবে।' আমরা বলাবলি করছিলাম। 'একটা পা আমাদের ওপরে পড়লে আমরা টমাটোর মত থেঁতলে যাব। আর এই হাতী প্রোফেসার রামগতি—'

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বলে

উঠল। চুপি দিয়ে দেখলাম ভিতরে তিনদিক ঘিরে চমৎকার গ্যালারী পাতা হয়ে গেছে। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা জায়গা হাঁটুর সামনে উঁচু করে লাল সালু দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ওটা রিং। রিং-এর মধ্যে থেকে সার্কাসের লোকেরা খেলা দেখাবে। গ্যালারীর নিচে থেকে আরম্ভ করে রিং পর্যন্ত চেয়ার বিছানো। চেয়ারে বসে যারা খেলা দেখবে তাদের বেশি দামের টিকিট কাটতে হবে। আমরা বলাবলি করতাম। দেখতে দেখতে আরও একটু সময় কাটল। তারপর সার্কাসের বাজনা শুরু হল। তাঁবুর বাইরে টিকিট-ঘরের ওধারে একটা চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। সেখানে সার্কাসের ব্যাণ্ড পার্টি বসে গেছে। ড্রামের শব্দ, ক্লেরিওনেট ব্যাগ পাইপের বাজনা। আমাদের হৃৎপিণ্ড সেই বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। টিকিট-ঘরে টিকিট কাটা শুরু হয়ে গেল যেন। ছুটে সেখানে গিয়ে ভিড় করলাম। কিন্তু বেশিদূর এগোনো গেল না, বগলে তখনও বই-খাতার বোঝা আমাদের। দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলাম 'ফার্স্ট ক্লাস' 'সেকেণ্ড ক্লাস'—'হু' গ্যালারী', 'গ্যালারী'—'গ্যালারী'। আর টাকা-পয়সার ঝনঝন আওয়াজ।

কিন্তু আর তো রাত করা যায় না। এক সময় দেখলাম আমাদের দলের নস্তুর কাকাবাবু এসে নস্তুর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। 'এ্যাঁ, সার্কাস দেখে পেট ভরবে! সেই কখন স্কুলের ছুটি হয়েছে। এখনো মাঠে ঘোরাঘুরি। ঘরে ফেরার নামটি নেই—আজ তোমার পিঠে আমি কাঠ ভাঙব।' শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। ঘরে বাবা মা দাদা কাকার বকুনি খাওয়ার কথা মনে পড়তে সবাই বাড়ির দিকে ফিরে চললাম। কেবল এইটুকু শুনে রেখে গেলাম রাত সাড়ে ন'টায় দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের ফার্স্ট নাইটের খেলা শুরু হবে। আজ সব গুছিয়ে সাজিয়ে একটার বেশি শো দেখানো সম্ভব হ'ল না। কাল থেকে দুটো শো। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা আর রাত সাড়ে ন'টা।

এই হ'ত আমাদের। শহরে বছর বছর সার্কাস যাত্রা থিয়েটার সিনেমা এসেছে। কিন্তু প্রথম রাত্রেই কিছু দেখতে পেরেছি কি? আমাদের মত স্কুলে পড়ুয়া শতকরা আশী জনের ভাগ্যে এই ঘটত। 'না না, সামনে পরীক্ষা, উহু, ওসব আব্দার ছেড়ে দাও, সার্কাস-সিনেমার কথা দিনকতক ভুলে যাও।' নয়তো: 'নতুন ক্লাসে উঠেছে মেলাই বই খাতা কিনতে হবে, বাজে পয়সা নষ্ট করা করা চলবে না।' শুনে মনের অবস্থা কি হ'ত এক এক জনের বেশ অনুমান করতে পারছেন। সকালে উঠেই আমাদের মধ্যে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়ে গেল কাল রাত্রে কে সার্কাস দেখতে পেরেছিল। পেয়েও গেলাম। অরুণ এসে বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমি, মামাবাবুর সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে বসে কাল খেলা দেখলাম। গ্র্যাণ্ড!'

'কি কি দেখলি?' বাকি পাঁচজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'কি দেখিনি, সব,—ভল্লুকের নাচ, ঘোড়ার খেলা, বাঘের মুখের ভিতরে মাথা ঢোকানো, বানরের খেলা, আগুনের বল লোফালুফি, তারের ওপর সাইকেল চালানো, ট্রাপিজের খেলা, আর সব খেলার শেষে আসল খেলা প্রোফেসার রামগতির বুকের ওপর হাতী তোলা। হাতীর পিঠে গদীর ওপর সুন্দর একটা মেয়ে বসে থেকে আমাদের স্যালুট জানিয়েছিল!' অরুণ হাসল।

অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

'মেয়েটা কে জানিস?' অরুণ প্রশ্ন করে।

'কি করে জানব!' মুখ কালো করে উত্তর দিলাম বাকী পাঁচ জন। 'আমরা তো আর সার্কাস দেখতে—'

আমাদের কানের কাছে মুখ এনে অরুণ ফিসফিসিয়ে বলল, 'প্রোফেসার রামগতির বৌ ওটি—বুঝলি, মামাবাবু কাল বাড়িতে মাকে বলছিল।'

'হবে হয়তো।' আমারা বিড়বিড় করে বললাম। বুকের ভিতর কেমন খালি-খালি ঠেকছিল। যেন অরুণ সব দেখে শুনে রাজ্য

জয় করে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে করুণার হাসি হাসছে। আমরা কিছু না। আমাদের জন্ম ব্যর্থ। কিন্তু ঈর্ষা করলেও অরুণকে তা বুঝতে দিলাম না। কেননা তাতে আমাদের ক্ষতি। আজ আবার স্কুলের মাঠে ঘুরে ঘুরে যখন এই-তাঁবু সেই-তাঁবু দেখব তখন অরুণকে সঙ্গে না রাখলে আমরা জানব কি করে কে তারের ওপর সাইকেল চালিয়েছিল, ঘোড়ার ট্রেনার কে, রিং-মাস্টার ঠিক কোন্ মানুষটা, দুটো চীনা মেয়ে ট্রাপিজের খেলা দেখায় ওরা কি এরা?

সেদিন মাঠে নেমে প্রথম হোঁচট খেলাম বাঘ ভল্লুক বানর ঘোড়া মায় গাধা-ছাগলের তাঁবুগুলোর সামনে বড় বড় পর্দা ঝুলছে দেখে। কি ব্যাপার? না সার্কাসের দলের লোকেরা পাব্লিককে এমনি এসব দেখতে দেবে না। এমনি দেখাবার নিয়ম নেই। খেলা না দেখলেও সার্কাসের জন্তু জানোয়ার দেখতে হলে পয়সা লাগে। বুঝলাম প্রথম দিন ওরা গোছগাছ করে উঠতে পারেনি বলে তাঁবুর দরজা খোলা ছিল, উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যাহোক আমরা দেখতে পেরেছিলাম। সুতরাং বাঘ ভল্লুক ঘোড়া বানরের আশা ছেড়ে দিয়ে অগত্যা হাতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই সব। অরুণচন্দ্র আঙুল বাড়িয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল 'ওই ওটা,—এক পায়ে শেকল বাঁধা যেটার। দু'পায়ে বাঁধা হাতীটার মেজাজ বিগড়ে আছে ক'দিন ধরে। প্রোফেসার রামগতি সেটাকে এখন বুকে তুলছে না।'

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে হাতী দেখলাম। তারপর অরুণ আমাদের টেনে নিয়ে যায় অন্যদিকে। একটা তাঁবুর ভিতর ভসভস করে স্টোভ জ্বলছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম স্টোভের ওপর বড় একটা এল্যুমিনিয়মের হাঁড়ি চাপানো। বুঝলাম মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। 'মুর্গির মাংস? খাসীর মাংস? গরুর? গন্ধটা যেন কেমন কেমন লাগছে।'

শুনে অরুণ ধমক দিয়ে উঠল। 'ধ্যেৎ! মাস্টার কাল্লু—ও তো হিন্দু। হুঁ, গরুর মাংস খাবে কিরে। হ্যাঁ, মুর্গি খায়,—রোজ

তু'বেলা মুর্গির মাংস আর ফলের রস চাই—মামাবাবু বলছিল। না হলে তাগড়া তাগড়া ঘোড়াগুলোকে সামাল দেবে কি করে।'

পায়জামা পরা গেঞ্জি গায়ে ঘোড়ার ট্রেনার মাস্টার কাল্লু একটা ক্যাম্পখাটের ওপর শুয়ে শুয়ে বর্মা চুরুট টানছে আর ঘাঘরা পরা মেয়েটা মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে মাঝে মাঝে হাঁড়ির ঢাকনা তুলে মাংস কেমন সিদ্ধ হল পরীক্ষা করছে, আর মাস্টার কাল্লুর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে।

'ওটা কি কাল্লুর বৌ?' ফিসফিসিয়ে অরুণকে প্রশ্ন করলাম।

অরুণ মাথা নাড়ল। 'হবে হয়তো, ঠিক জানি না। কাল তো ওকে খেলার সময় দেখতে পাইনি।'

'বোধ করি আজ ওর খেলা আছে।' আমরা বলাবলি করলাম। 'আজ হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়েছে নতুন খেলা দেখানো হবে বলে, তাই না?'

অরুণ ঘাড় কাত করল। 'আজ মাস্টার রামগতি আর বুকে হাতী তুলছে না, জানিস তো?'

আমরা অবাক হয়ে অরুণের মুখের দিকে তাকাই। কেননা একটা ক্ষীণ আশা বুকের মধ্যে নিয়ে আমরা সারাদিন চলাফেরা করছিলাম। যদি সন্ধ্যার দিকে বাবা মা দাদা কাকারা কেউ রাজী হয়ে গিয়ে পাঁচ আনা পয়সা বার করে দেয় তবে,—গ্যালারীর টিকিট পাঁচ আনা, ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার পাঁচ টাকা, সেকেণ্ড ক্লাস পিছনের সারির চেয়ার তু'টাকা। হ্যাণ্ডবিল দেখে টিকিটের দামগুলো আমরা মুখস্থ করে রেখেছিলাম। মুখ কালো করে অরুণকে প্রশ্ন করলাম: 'হাতী তুলছে না আজ প্রোফেসার রামগতি?'

'আজ মোটর টেনে ধরবে, চলন্ত মোটর গাড়ি। কাল প্রোফেসার রামগতি খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে নিজের

মুখে জানিয়ে দিয়েছে।' কথা শেষ করে অরুণ পরে বলল, 'আজও আমি সার্কাস দেখতে আসব। আজ বাবার সঙ্গে আসব। সম্ভবত আজ বাবা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটবে।'

পৃথিবীতে অরুণের মত সুখী কেউ নেই। কথাটা চিন্তা করতে করতে অরুণের হাত ধরে আবার আমরা অন্য তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। 'এই এরা দু'বোন—আ, কী চমৎকার ট্রাপিজের খেলা করে! যেন দুটো পাখি হয়ে শূন্যে ডিগবাজি খায়, এক ট্রাপিজ থেকে উড়ে আর এক ট্রাপিজে যায়।'

ফ্যালফ্যাল করে চীনা মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। একসঙ্গে এতগুলি ছোট ছেলেকে তাঁবুর সামনে ভিড় করে দাঁড়াতে দেখে দু'বোন হাসাহাসি করে চুং-চাং কি যেন বলছিল। আমাদের বগলে বইখাতা দেখে স্কুলের ছাত্র টের পেয়ে সম্ভবত কি বলাবলি করছিল ওরা অনুমান করলাম।

তার পর আর একটা তাঁবু। 'ম্যাজিক দেখায় এরা, আগুনের বল লোফালুফি করে, মুখের মধ্যে আগুন রাখতে পারে।' অরুণ বলল, 'বাপটার চেয়ে ছেলেটার খেলা ভাল।'

বাপ-বেটাকে দেখা শেষ করে আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। 'এরা দুটি মা-মেয়ে, তারের ওপর হাঁটে, তারের ওপর সাইকেল চালায়।' অরুণ বলল, 'এরা আগে গ্রেট রেমন সার্কাসে ছিল। ঝগড়া করে সেখানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবছর দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসে এসে যোগ দিয়েছে। মেয়েটা কি সুন্দর, না?'

আমি অরুণের মুখের দিকে তাকাই। মা মেয়ে একটা টিপয়ের দু'পাশে দুটো চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে আর গল্প করছে। এখানেও স্টোভ জ্বলছে। যেন খুব ঝাল পেঁয়াজ দিয়ে কি রান্না হচ্ছে। হাফ-প্যান্ট পরা বুড়োমতন একটা লোক স্টোভের সামনে বসে আছে। 'চাকর, লোকটা ওদের চাকর, কেমন?'

'ধ্যেৎ।' আমার কথা শুনে অরুণ হাসল। 'মেয়েটার বাপ—

রান্না-বান্নার কাজ ওই করে। বৌকে মেয়েকে এসব খাটুনিতে টানে না। তারের ওপর হাঁটা আর সাইকেল চালানো কি চারটিখানি কথা!' তারপর অরুণ বলল তার মামাবাবুর সঙ্গে কাল রাত্রে বুড়োটা কথা বলেছে। সার্কাস আরম্ভ হবার আগে লোকটা গেট্-এর ওধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। মামাবাবু পাশের স্টলে সিগারেট কিনতে গেছে। তখন আলাপ। ওর কাছ থেকে তো জানা গেল ওরা আগে গ্রেট রেমন সার্কাসে ছিল।

'মাদ্রাজী?' নন্তু প্রশ্ন করল।

অরুণ মাথা নাড়ল। 'মারাঠী।'

'মেয়েটা দেখতে সুন্দর।'

আমি ফিসফিসিয়ে বলতে অরুণ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। 'সুন্দর মুখ দেখবি তো ইদিকে আয়।'

আমরা অরুণকে অনুসরণ করলাম। আরও দু-তিন জনের পরিচয় পাওয়া গেল ওর কল্যাণে। যে লোকটা জোকার সাজে তাকে দেখলাম, বাঘের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে মাথা বার করে আনে দুঃসাহসী খেলোয়াড়কে দেখলাম। এত বড় বড় চোখ। লাল টকটক করছে। মোটা থ্যাবড়া নাক। যেমন ভীষণদর্শন তেমনি যোয়ান। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে কচকচ করে একটা মূলো খাচ্চে। এক হাতে মূলো আর এক হাতের আঙুলের মধ্যে ধরা বর্মা চুরুট।

'স্যামুয়েল দাস।' অরুণ ফিসফিসিয়ে বলল, 'সার্কাসের দলে এই একমাত্র বাঙালী খেলোয়াড়। বাঙালী খ্রীষ্টান। কাল খেলা দেখাবার সময় পরিচয় দিলে। সেই দশ বছর বয়স থেকে সার্কাসের দলে আছে। ওয়ার্লডের বড় বড় সার্কাসের দলে স্যামুয়েল দাস খেলা দেখিয়েছে। একবার আফ্রিকার একটা শহরে বাঘের খেলা দেখাবার সময় বাঘ তার কপালে থাবা মেরেছিল! এখনো দাগ আছে দেখছিস না?'

ভয়ে বিস্ময়ে আমরা লোকটার মুখের দিকে তাকাই। মাঝে মাঝে লাল-টকটকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে আমাদের দেখছিল। তাতে যেন আমাদের আরও বেশি ভয় করছিল।

'বুঝলি, স্যামুয়েল দাস যদি আজ দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের দল ছেড়ে চলে যায় তবে এই সার্কাস টিঁকবে না—মামাবাবুরা কাল বলাবলি করছিল। খেলার মধ্যে দুটোই তো দেখবার মতন। বুকে হাতী তোলা আর বাঘের খেলা।'

অরুণের মামাবাবুদের কথা আমরা মনে মনে সমর্থন করলাম। স্যামুয়েল দাসকে দেখে আমাদের যেমন ভয় হচ্ছিল তেমনি ভিতরে ভিতরে গর্ববোধ করছিলাম। অতবড় সার্কাসে একমাত্র বাঙালী খেলোয়াড়।

স্যামুয়েল দাসের তাঁবু পার হয়ে আমরা একটা বেশ বড়মতন তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। অরুণ আমাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'প্রোফেসার রামগতির আস্তানা। ছাখ—কী চমৎকার সাজান-গোছান ভিতরটা।'

দেখলাম তাই। ওই বুঝি প্রোফেসার রামগতি? একটা আরাম কেদারায় শুয়ে আছে। কত বয়স? ত্রিশ-বত্রিশ? কিন্তু আরও কম মনে হল। গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ। সুডোল সুঠাম দুখানা বাহু মাথার ওপর তুলে দিয়ে দুহাতের তেলোর ওপর মাথা রেখে কি যেন চিন্তা করছে। খুব ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। পরনে একটা ট্রাউজার, পায়ে হরিণ-চামড়ার চটি। হাতকাটা একটা গেঞ্জি গায়ে থাকার দরুণ বুকটা দেখতে পারছিলাম। কী চওড়া, কত উঁচু। একটা পাথরের পাটাতন। তা না হলে আর এই বুকের ওপর হাতী তুলবে কি করে। চিন্তা করে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে, কি করে যেন আমরা পাঁচটি ছেলে একসঙ্গে হাতজোড় করে কপালে ঠেকালাম। যেমন মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রণাম জানাই। আর আশ্চর্য,

আমাদের দেখে প্রোফেসার রামগতিও বাহু দুটো গুটিয়ে এনে দুহাত একত্র করে অভিবাদন জানাল। একটা কথা মনে পড়ে গেল আমাদের। বাংলার মাস্টার জনার্দনবাবু একদিন বলেছিলেন, 'যারা সত্যিকারের বীর তারা অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী হয়।' এখানে তার পরিচয় পেলাম। আমাদের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে আবার তিনি চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করতে থাকেন।

দু-তিনটে পর্দা ঝুলিয়ে তাঁবুর ভিতরটা যেন ভাগ করে করে কামরা তৈরি করা হয়েছে। একটা পর্দা সরিয়ে মেয়েটি এসে প্রোফেসার রামগতির কেদারার পাশে দাঁড়াল। অরুণের কথা যে কত সত্য তা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে টের পেলাম। চোখে কি সুর্মা! কিন্তু আমাদের মনে হল যেন কাজল পরেছে। কলকাতার মেয়েদের মতন কাজল বুলানো বড় বড় চোখ। বেশ ছোটখাটো দেখতে। কিন্তু কী সুন্দর নাকখানা। বেণী না, একটা এলো খোঁপা সরু ছিমছাম ঘাড়ের ওপর মুখ থুবড়ে আছে। হ্যাঁ, রংটাই বেশি সুন্দর। সেই যে পুরাণে এক আশ্রমকন্যার বর্ণনা দেওয়া আছে,—হাতীর দাঁতের মতন গায়ের রং, এরও তাই দেখলাম।

'মীরাবাঈ নাম।' অরুণ ফিসফিসিয়ে বলল, 'মামাবাবু সেই মারাঠী লোকটার কাছ থেকে কৌশলে নামটা জানতে পেরেছে। প্রোফেসার রামগতি কেবল মীরা বলে ডাকে।'

দেখলাম মীরা কেদারার পাশে এসে দাঁড়াতে রামগতি চোখ খুলল ও অল্প একটু হাসল। মেয়েটির হাতে একটা শ্বেতপাথরের বাটি। মনে হলো যেন আপেল কেটে আনা হয়েছে। বাটিটা একটা টিপয়ের ওপর রেখে মেয়েটি সেটা তুলে এনে আরাম কেদারার সামনে রাখল। তারপর ভিতরের দিকের আর একটা পর্দার দিকে তাকিয়ে ডাকল: 'কাঞ্চী!'

আর একটা মেয়ে। কালোমতন দেখতে, সাধারণ বেশভূষা। মাথায় বেণী। চেহারাটা একটু রুক্ষ হলেও লম্বাটে গড়ন

বলে মানিয়ে গেছে। সামনে এসে দাঁড়াতেই মীরা বলল, 'কফি।'

কালো মেয়েটা ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ পর্দার আড়ালে চলে গেল এবং একটু পরে দুটো বড় পেয়ালা হাতে ফিরে এল। কফির পেয়ালা টিপয়ের ওপর রাখতে মীরা ওদিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে কি ইসারা করতে আবার সে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

'ওদের চাকরানী বলে মনে হচ্ছে, তাই না? সার্কাসের খেলার সময় মেয়েটাকে একবারও দেখিনি।'

অরুণের কথায় সায় দেবার আগে আমি বললাম, 'আজ নতুন নতুন খেলা দেখানোর কথা, হয়তো—।'

অরুণ মাথা নাড়ল। 'সেই বুড়ো মারাঠীটার কাছ থেকে মামাবাবু জানতে পেরেছে প্রোফেসার রামগতি রান্নাবান্না এবং নিজেদের আর পাঁচটা কাজের জন্য তিনটে চাকর ও দুটি চাকরানী রেখেছে। এই মেয়েটা বোধ করি নেপালী কি খাসিয়া।'

নন্তু তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল। 'তা হলে রং ফর্সা হ'ত নাক চেপ্টা হ'ত। আমার মনে হয় এ-ও সাউথ ইণ্ডিয়ার মেয়ে।'

অনুমানটা ঠিক হল না বুঝে অরুণ মুখটা কালো করে চুপ করে রইল। বস্তুত তার মামাবাবু এর সম্পর্কে ঠিক খবরটা জানতে না পারার দরুণ অরুণ ভুল করে ফেলে মন খারাপ করছে টের পেয়ে আমি ওর মন রাখতে তাড়াতাড়ি বললাম, 'চাকর-চাকরানী কোন জায়গার সেটা তো বড় কথা না, প্রোফেসার রামগতি যে বৌকে সুখ দিতে পাঁচটা দাসদাসী রেখে দিয়েছে সেটাই বড় কথা।'

চোখ বড় করে অরুণ বলল, 'তবে! সুখ বলে সুখ, একেবারে মাথায় করে রেখেছে! আ, তোরা তো দেখিসনি, হাতীর পিঠে গদীর ওপর যখন বসে থাকে তখন হীরার মালা গলায় পরে, কানে হীরার ফুল। পাথর-ফাথর নয়, খাঁটি

ডায়মণ্ড। কাল মামাবাবুরা বলছিল। রাজপুতানার মেয়ে, গয়নায় খুব শখ। প্রোফেসার রামগতি দামী দামী গয়না গড়িয়ে দিচ্ছে।'

'তা' দেবেনা কেন।' আমরা বললাম, 'সার্কাস দেখিয়ে ফি এক-একটা শহর থেকে কম টাকা লুটছে ?'

দুজনে বসে গল্প করতে করতে আপেল খেল তারপর কফির পেয়ালা হাতে তুলে নিয়েছে, এমন সময়ে, সেই যে কথা আছে কমলবনে হাতী ঢুকল,—ভারি চপ্পলের দুপদাপ আওয়াজ তুলে তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুকল স্যামুয়েল দাস। হ্যাঁ,—দেখলাম ভীষণ খাতির স্যামুয়েল দাসের! মীরা হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিতে স্যামুয়েল তার কালো শক্ত রোমশ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে কী সাংঘাতিক একটা ঝাঁকুনি দিলে! আর সেই ঝাঁকুনি খেয়ে মীরাবাঈ খিলখিল করে হেসে উঠল। প্রোফেসার রামগতিও হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডশেক্ করল কিন্তু তেমন করে হাসল না। ইংরেজীতে কথাবার্তা হ'ল। মীরা তখনও হাসছে। হাসতে হাসতে স্যামুয়েল দাসকে বসতে বলে পর্দার দিকে তাকিয়ে রূপালী গলায় ডাকল : 'কাঞ্চী!'

অরুণের কানে কানে বললাম, 'বেশ ইংরেজী বলতে পারে মীরাবাঈ।'

'নিশ্চয়ই।' অরুণ ঘাড় নাড়ল। 'মেয়েটা নাকি খুব শিক্ষিতা। মামাবাবুরা কাল বলাবলি করছিল, প্রোফেসার রামগতিও একজন শিক্ষিত লোক।'

মোটের ওপর ঘুরে ঘুরে সার্কাসের দলের সবাইকে দেখলাম, সব দেখলাম, কিন্তু সার্কাস দেখা হল না। কি, সেই রাত্রেও বাবা কাকা দাদা দিদিমা ও মাসিমা আমাদের সাধে বাদ সাধল। 'এখন না, আজ না, যাক না দু'চার দিন, সার্কাস তো আর রাতারাতি চলে যাচ্ছে না।'

কি আর করা। পরদিন আবার অরুণচন্দ্রকে টেনে নিলাম দলে। অরুণ আবার সবিস্তারে আগের রাত্রের সব-ক'টা খেলার বিবরণ দিল। প্রোফেসার রামগতি বুকে হাতি তোলেনি, চলন্ত মোটরগাড়ি টেনে ধরে শহরের লোককে তাক লাগিয়ে দিল।

'তবে তো কাল আর মীরাকে দেখা হয়নি।' আমরা বলতেই অরুণ হাসল। 'পাগল, মীরাবাঈ যদি একবার আর একবারই শুধু আসবে, এসে দর্শকদের দেখা না দেয় তো শো অসম্পূর্ণ থেকে গেল। ওই যে সেজেগুজে রিং-এর মধ্যে এসে একবার ওর ঢোকা ওটাও খেলার একটা অঙ্গ। যদিও মাটিতে পা ঠেকাবে না। আগের রাত্রে এসেছিল হাতীর পিঠে চড়ে। সেই হাতী প্রোফেসার রামগতি বুকে নিলে, কাল ছিল মোটরগাড়িতে বসা। মীরাকে-সুদ্ধ চলন্ত গাড়ি দুহাতে ধরে রামগতি আটকে রাখল। বাব্বাঃ, কি হাততালি তখন চারদিক থেকে! পুলিশসাহেব, এস-ডি-ও পর্যন্ত খেলা দেখতে এসেছিলেন।'

তারপর আর কি, আবার সারাদিন সার্কাসের মাঠে ঘুরে ঘুরে একবার চীনা মেয়েদের তাঁবুর সামনে দাঁড়ানো, একবার স্যামুয়েল দাসকে দেখা, একবার সেই মারাঠি বুড়ো আর তার স্ত্রী ও সুন্দরী মেয়েকে দেখা এবং সকলকে দেখে পরে প্রোফেসার রামগতির তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিল কি আমাদের। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলল, বাজনা বেজে উঠল আর শুনতে পাওয়া গেল টিকিট ঘরে টাকা-আধুলির ঝনঝন আওয়াজ। তারপর এক সময় রূপকথার দেশ সেই আলো-জ্বালা ক্লেরিওনেট-ড্রামের শব্দমুখরিত সার্কাসের তাঁবু পিছনে রেখে আমরা ঘরে ফিরে এসে হ্যারিকেনের আলোর নীচে বই খুলে বসেছি। ঐ বসে থাকাই সার হ'ত। এক বর্ণ পড়া হ'ত কি? মন পড়ে থাকত খেলার মাঠে। এই বুঝি স্যামুয়েল তার গলাটা রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগারের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, এখন প্রোফেসার রামগতি

বুকে হাতী তুলবে। হাতীর পিঠে সোনার ঝালর দেওয়া গদীর ওপর বসা মীরাবাঈ! গলায় হীরা, কানে হীরা। ক্লেরিওনেট ড্রাম এখন আস্তে আস্তে বাজছে, একটা চাপা উৎকণ্ঠা রিং থেকে গ্যালারী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অতবড় একটা হাতীকে বুকের ওপর তোলার সেই ভয়াল ভীষণ মুহূর্তের জন্য সবাই মিনিট সেকেণ্ড গুনে অপেক্ষা করছে!

ছ'দিন চলে গেল। তারপর সেদিন সকালে সাদা নীল সবুজ হ্যাণ্ডবিলের পরিবর্তে আগুনের মতন লালরঙের টকটকে হ্যাণ্ডবিল শহরের রাস্তায় ঘাটে ছড়িয়ে বাজনা-সমেত ঘোড়ার গাড়িটা শহর ছেড়ে শহরতলির দিকে চলে গেল। অদ্য শেষ রজনী। সেরা খেলা। স্যামুয়েল দাস বুনো বাঘের গলার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেবে। প্রোফেসার রামগতি জংলী হাতী বুকে তুলবে। শেষ দিনের জন্য কন্‌শেসন—স্কুলের ছেলেদের প্রবেশমূল্য অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হল। দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাস আজ রাত্রে খেলা দেখিয়ে এ বছরের মত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

কিন্তু তবু কি বাবা দাদা কাকা জ্যেঠারা রাজী হন! 'ওরা এই করে। কাল দেখবি আবার হ্যাণ্ডবিল পড়েছে। শহরবাসীর বিশেষ অনুরোধে দি গ্রেট এশিয়ান আরও দুদিন থেকে গেল।'

তবু যাহোক পাঁচ আনার জায়গায় একেবারে দশ পয়সায় টিকিট নেমে আসাতে তাঁরা রাজী হলেন। যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। কি করে যে দিনটা কাটালাম আর বিকেল। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে খাওয়া শেষ। সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম এবং উর্ধ্বশ্বাসে মাঠে ছুটে গিয়ে টিকিটঘরের জানালার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। যথাসময়ে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে নির্দিষ্ট আসনে বসা গেল।

অসম্ভব ভীড়! শেষ রজনী, তার ওপর ছাত্রদের জন্য কন্‌শেসন। গ্যালারীতে জায়গা নেই, সব-ক'টা চেয়ার পূর্ণ।

বলা বাহুল্য অরুণ একনাগাড়ে পাঁচ রাত খেলা দেখে আবার আমাদের সঙ্গেও শো দেখতে এল। শেষ রাতের খেলা ভাল হয়। অরুণ বার বার বলছিল। বলতে কি অরুণচন্দ্রকে পেয়ে আমাদের খুব ভাল লাগছিল। সে-ই গড়গড় করে বলতে লাগল প্রথম কি দিয়ে খেলা আরম্ভ হবে। রিং-মাস্টার চাবুক তুলতে জোকারটা কি করবে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় শো আরম্ভ হল। প্রথম দিকের খেলাগুলো অসম্ভব ভাল হল। অরুণ বলল আজ মেয়ে দুটো যেমন ট্রাপিজের খেলা দেখাল আর একদিনও এত ভাল হয়নি। ট্রাপিজের খেলা শেষ করে চীনা মেয়েদুটো স্যালুট জানিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে রিং ছেড়ে পর্দার ওপারে অদৃশ্য হতে ঢং করে একটা ঘণ্টা পড়ল।

'ফার্স্ট হাফ শেষ।' অরুণ বলল, 'এইবার আসল খেলা শুরু হবে। এখনই বোধ হয়—'

অরুণের মুখের কথা শেষ হল না। নীল ট্রাউজার পরা মলমলের পাঞ্জাবি গায়ে গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ সুশ্রী পুরুষ প্রোফেসার রামগতি এসে রিং-এর মাঝখানে দাঁড়াল। এক মুহূর্তে কলরব গুঞ্জন থেমে গেল।

'ব্যাপার কি!' অরুণ ফিসফিস করে বলল, 'আমার যেন মনে হচ্ছে প্রোফেসার রামগতি দর্শকদের কিছু বলতে এসেছে—খেলার পোশাক না পরে এভাবে তো ভিতরে আসে না। মাত্র প্রথম দিন শো শেষ হবার মুখে একবার এসেছিল। এসে জানিয়েছিল গোছগাছ করে উঠতে উঠতে দেরি হয়ে গেল বলে দুটো শো দেওয়া গেল না; সেজন্যে তার দুঃখ হচ্ছে। কাল থেকে দুবার করে শো হবে। কিন্তু আজ, আজ বোধ করি শেষ রাত্রি বলে বিদায় জানাতে এসেছে। দেখা যাক।'

অরুণ চুপ করল। আমরা চুপ। সকলের দৃষ্টি রিং-এর দিকে। ইংরাজীতে বলে গেল প্রোফেসার রামগতি। যা বুঝলাম

তার অর্থ স্যামুয়েল দাস এই কিছুক্ষণ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং আজ আর বাঘের খেলা দেখানো গেল না। প্রোফেসার রামগতি সেজন্যে খুবই দুঃখিত। তবে তাঁর আশা, মাত্র একটা আইটেম বাদ গেলেও এই চমৎকার ছোট শহরের ভদ্র নাগরিকেরা তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। বলে, রামগতি স্যালুট না, দু'হাত একত্র করে কপালে ঠেকিয়ে সকলকে ঘুরে ঘুরে অভিবাদন জানিয়ে আবার পর্দার ওপারে সরে গেল।

একটা আফশোসের গুঞ্জন উঠল, একটা চাপা ক্ষোভের ঝঙ্কার শোনা গেল। কিন্তু সব ছাপিয়ে যে কথাটা কানে বড় হয়ে বাজছিল তা হল এই ঃ 'লোকটা ভীষণ ভদ্র, অমায়িক, মার্জিত। শিক্ষিত কিনা। না হলে কত আইটেম বাদ দিয়ে দিয়ে আগেকার সার্কাসগুলো খেলা দেখিয়ে গেছে। এমন সুন্দর করে ক্ষমা চাইতে আসেনি কেউ।'

আর একদল বলল, 'যাক না বাঘের খেলা, ও অনেকবার দেখা, বুকে হাতী তোলা তো আর বাদ পড়ছে না।'

আমরা স্যামুয়েল দাসকে ভুলে গিয়ে রিং-এর ওপর চোখ রেখে স্থির হয়ে বসি। ঘণ্টা পড়ল। খেলা আরম্ভ হল। এগুলো সাধারণ খেলা—তা হলেও সুন্দর। লোকটা ম্যাজিক দেখাচ্ছে। এখানে জোকারের রংঢংটাই বেশি ভাল লাগছিল। একটা গাধার পিঠে চড়ে মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ বার করছে আর ভেংচি কেটে লোক হাসাচ্ছে। ম্যাজিক শেষ হল। তারপর দেখা গেল চার-পাঁচটা কুলী ছুটে এসে রিং-এর মধ্যে এটা টানছে ওটা সরাচ্ছে।

'এবার হাতীর খেলা।' অরুণ বলল, 'অর্থাৎ বুকের ওপর হাতী তোলা। এবার মীরা আসবে, মীরাবাঈকে দেখা যাবে।'

আমাদের মতন আরও অনেকে আনন্দের গুঞ্জন তুলল। চটপট হাত চালিয়ে কুলীরা সব আয়োজন ঠিক করে রিং-এর বাইরে চলে গেল। ঘণ্টা পড়ল। প্রোফেসর রামগতি লাল সিল্কের খাটো জাঙ্গিয়া

এবং খাটো জামা পরে ভিতরে ঢুকে স্যালুট জানাল। রিং-মাস্টার এবং রিং-বয় থেকে আরম্ভ করে জোকারটা পর্যন্ত এখন চটপট হাত চালিয়ে কাঠের তক্তা বিছিয়ে তার ওপর উঁচু জাজিম এবং বালিশ রেখে প্রোফেসার রামগতির শয্যা তৈরি করতে ব্যস্ত। বিছানা তৈরি হতে প্রোফেসার শুয়ে পড়ল। পড়ল বুকের ওপর ভারি চওড়া তক্তা। ঢং-ঢং ঢং-ঢং—ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদুমন্থর গতিতে হাতী এসে রিং-এর মাঝখানে দাঁড়াল। কিন্তু হাতীর পিঠে সোনার ঝালর পরানো গদী কোথায়—কোথায় সেই রূপকথার রাজকন্যার মতন অসামান্যা সুন্দরী মীরাবাঈ। কিন্তু এই নিয়ে তো তর্ক উঠতে পারে না, এই নিয়ে অভিযোগ চলে না— হাতী বুকের ওপর তোলাটাই হ'ল আসল। হাতীর পিঠে মীরাকে থাকতেই হবে, দি গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের হ্যাণ্ডবিলেও এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে না। সুতরাং—সুতরাং চাপা ক্ষোভ গোপন অভিমান বুকে নিয়ে দশজনের মতন আমরাও আলোর নিচে কাঠের বিছানায় কাঠ বুকে নিয়ে প্রোফেসার রামগতির রেডী ওয়ান-টু-থ্রি-র অপেক্ষায় দম বন্ধ করে শুয়ে থাকার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকি। হাতীর পা নড়ল, শুড় তুলে উঠল। সতর্ক ট্রেনার হাতের ইঙ্গিত করতে হাতী তক্তার ওপরে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে উত্তেজনায় পাঁচশ' দর্শকের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে রইল। বাস্ হয়ে গেছে,—হয়ে গেল। হাতী বুকের ওপর থেকে মাটিতে নামল। রিং-মাস্টার থেকে আরম্ভ করে জোকারটা পর্যন্ত চটপটে হাতে বুকের তক্তা সরিয়ে নিল।

কি? কি? কি! রিং-এর এপার থেকে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে পুলিশসাহেব লাফিয়ে রিং-এর ভিতরে চলে গেলেন। এস. ডি. ও। হ্যাঁ, সিভিল-সার্জন উপস্থিত ছিলেন। তিনিও। পুলিশ। একজন না। সার্কাসের তাঁবুর বাইরে পাহারায় ছিল তারাও ছুটে এল। তারপর দর্শকের দল—ছেলে বুড়ো জোয়ান,

মেয়েদের ওদিক থেকে ভয়ে ছু-তিনটা শিশু একসঙ্গে কেঁদে উঠল। আর এদিকে 'হঠ্ যাও, নিকাল যাও, খেলা খতম, বাহার যাও'। আমরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ সব শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু। মাঠের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খবর পেলাম প্রোফেসার রামগতি সুইসাইড করেছেন। হাতীর তলায় এভাবে জীবন দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছাকৃত। এ-কথাই তিনি এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেছেন—তাঁর মৃত্যুর জন্যে আর কেউ দায়ী না, বা অ্যাকসিডেন্ট বলে যেন কেউ ভুল না করে। এক মিনিট কেন, তিনি এর চেয়েও বড় হাতী আরো বেশিক্ষণ বুকের ওপর রেখেছেন। সুতরাং এই মৃত্যু তাঁর পরাজয় না—অন্য জিনিস। খাটো জাঙ্গিয়ার ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটা পুলিশ উদ্ধার করেছে শোনা গেল।

শহরসুদ্ধ লোকের মত আমরাও বোকা বোকা হয়ে ঘরে ফিরলাম। বাবা মা দাদা দিদি কাকা জ্যেঠারা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এভাবে লোকটা প্রাণ দিল—এরকম তো শোনা যায় না। কারণ কি, কারণ কি। কে বলবে কার মনে কি আছে। ঈশ্বর!

পরদিন সকালে উঠেই মাঠের দিকে ছুটলাম। কিন্তু দেখলাম একটা শ্মশান। রাতারাতি তাঁবু নামিয়ে বাঁশ, খুঁটি, তারের বেড়া সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ছোট তাঁবুগুলি একটাও নেই। কেবল কয়েক সারি গরুর গাড়ি দাঁড়ানো আর কুলিগুলো ভারি ভারি বাক্স এনে টেনে টেনে গাড়িতে তুলছে। বাঘ ভল্লুক বানরের গাড়িগুলো নাকি রাত চারটার সময় রেলস্টেশনে চলে গেছে। কুলী ছাড়া সার্কাসের দলের আর একটি মুখও সেখানে দেখা গেল না। কেবল দেখলাম শহরের পরিচিত সব মুখ উকিল ডাক্তার মায় আমাদের স্কুলের মাস্টাররা পর্যন্ত এখানে ওখানে ছোট ছোট ভিড় করে দাঁড়িয়ে শূন্য মাঠটা দেখছে আর চাপা গলায় কি যেন বলাবলি করছে।

অরুণ ছুটে এসে বলল, 'শুনেছিস কি ব্যাপার হয়েছে?'

'কি!' চমকে ওর মুখের দিকে তাকাই।

'আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম সব। হেডমাস্টারের কাছে আমাদের অঙ্কের মাস্টার বলছিলেন। মেয়েটা কাল বিকেলে স্যামুয়েল দাসের সঙ্গে পালিয়েছে। সেই দুঃখেই প্রোফেসার রামগতি সুইসাইড করেছে।'

'কোন্ মেয়ে! মীরাবাঈ?'

অরুণ ঘাড় নাড়ল আর বড় বড় চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'অবশ্য মামাবাবু কাল রাত্রে একবার বলেছিল, স্যামুয়েল দাসের অসুখ খবরটা বাজে—আসলে কাল বিকেল থেকেই নাকি তাকে তার তাঁবুতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এ যে—'

অরুণের কথা শেষ হল না। আর কিছু জানতে আমাদেরও ইচ্ছা বা কৌতূহল ছিল না। মাঠটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেললাম।

সার্কাস এসেছে শুনলে আজও ছোটবেলার সেই করুণ ভীষণ রাত্রির কথা মনে পড়ে। আর ভাবি আত্মহত্যার জন্যে লোকটা কী ভয়ঙ্কর সুন্দর পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল।

চার ইয়ার

বলতে কি, মলয় না থাকলে আমাদের এ গল্প জমত না; বোধ করি, অসম্পূর্ণ থাকত কাহিনী।

সকলের শেষে ভগবান ওকে পাইয়ে দিলেন।

বিশ বছর পর আবার এক জায়গায় সব জড় হলাম।

কোথায়?

তার আগে শুনুন, আমরা কে।

চারজন।

সিগারেটের টিন ও তাসের প্যাকেট নিয়ে কলেজের কমনরুম সরগরম ক'রে রাখা বিখ্যাত সেই চার বন্ধু। হাবুল হালদার, মলয় নাগ, জোনাকি সেন ও আমি।

আ, একসঙ্গে ব'সে চারজন অনেক সিগারেট ফুঁকেছি, তাস পিটেছি, পার্কের নিরালা কোণে ঘাসের বিছানায় শুয়ে প্রেমের গল্প করেছি। ছুটির দুপুর কেটেছে সস্তা ভদ্র কোন রেস্টুরেণ্টে আড্ডা মেরে।

আশ্চর্য, ছুটির দিনেও শহর ছেড়ে কেউ কোথাও তখন পা বাড়াই নি—সুখের আড্ডাটি ভেঙে যাবে—ভয়ে।

আজ, মস্ত বড় ছুটির দিনে, সময়টিও ঠিক যখন দুপুর, অগাস্টের গনগনে রোদে রাস্তার অ্যাশ্‌ফল্ট তেতে পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে গেছে, কামড়ে ধরছে লোকের জুতো, মোটরগাড়ির টায়ার, রিক্‌শর ঠ্যাং, চার ইয়ারের তখন পুনর্মিলন হ'ল। হ্যাঁ, এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের দরজায়।

কী জায়গা, একবার চিন্তা ক'রে দেখুন।

সবচেয়ে কষ্ট হ'ল মলয়কে দেখে।

ঘামছিল ও। পকেট থেকে টুক্‌টুকে নীল রুমাল বার ক'রে ঘাড় মুছছিল। কপাল!

অবশ্য এক আড্ডার ইয়ার হ'লেও মলয় ছিল বয়সে আমাদের সকলের ছোট।

তাই, তখন থেকেই ওকে আমরা আদর দিতাম বেশি, স্নেহ করতাম, রাস্তায় বেরোলে তিনজনের মাঝখানে রেখে সর্বদা পথ চলেছি। ফুটবল খেলার মাঠে মলয়ের গায়ে ভিড়ের চাপ লাগবে ভয়ে তিনজন হাতের বেড়ি আল্‌গা করি নি। আর দেখতে ও চিরদিনই সুন্দর কিনা! কালো কোঁকড়া চুল, ফর্সা রং, মেয়েদের মতন লম্বা টাইপের মুখ।

রুমালে মুখ মোছা শেষ ক'রে দেখি, পকেট থেকে ও চীনাবাদাম তুলছে। দামী স্যুট্ পরনে, জুতোর চাক্‌চিক্য অম্লান আছে, সুন্দর ফিরোজা রঙের নেক্‌টাই। এবং এত বয়সেও, লক্ষ্য করলাম, মুখকান্তি বিমলিন হয় নি।

অর্থাৎ সবই আছে, সবই ছিল—নেই, শুধু ছিল না—

বুঝতে বাকি রইল না। আমাদের অবস্থা।

ভালো কথা, আগে আমাদের তিনজনের সাক্ষাতের বিবরণটা সেরে নিই।

প্রথমে হাবুলের সঙ্গে আমার দেখা স্ট্র্যাণ্ড রোডে। হাওড়া থেকে পায়দল করছিলাম। ডালহৌসি গন্তব্য। উত্তরপাড়ার বাসিন্দা আমি। বহুকালের ডেলিপ্যাসেঞ্জার। আজও আছি! অবশ্য এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। বেলা ন'টায় না এসে সাড়ে-বারোটায় মহানগরীর জঠরে ঢুকি। রুদ্ধশ্বাসে ট্রাম-বাস চাপবার আজ আর দরকার নেই। রোদ-পোড়া, চওড়া, ফাঁকা সড়ক ধ'রে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করি। একসময় গিয়ে অফিসপাড়ায় পৌঁছলেই হ'ল। হাতে এখন অঢেল সময়।

বস্তুত, রাস্তাটা বেশি ফাঁকা ছিল বলেই চোখে পড়ল হাবুলকে।

একটা লাইটপোস্টের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ও গঙ্গার ওপরের আকাশে দেখছিল চিল। বুঝলাম, ওরও হয়ে গেছে। বেলা যখন আড়াই প্রহর, অফিস-আদালত গম্‌গম্‌ করছে, তখন একমাথা চুল ও একগাল দাড়ি নিয়ে কেউ রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকলে কি বোঝা যায়? ময়লা, অর্ধছিন্ন বেশবাস বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট হ'ল দেখে—হোক্‌ তালিমারা সহস্র পটি লাগানো, আমার পায়ে তবু একজোড়া ডার্বি ছিল—হাবুলের পদযুগল নির্মমভাবে শূন্য ছেঁড়া স্যাণ্ডালটিও না।

'কামাখ্যা! মাইরি, একযুগ পরে দেখা।' হাবুল আমায় দেখেই চিনল। একগাল গোঁফদাড়ি সমেত হাসল। 'তারপর?'

'খবর কি?' আমিও হেসে প্রশ্ন করলাম। 'কোন্‌দিকে চললে?'

'এখন আর দিক্‌-ফিক্‌ নেই। যেদিক খুশি, হাঁটলেই হ'ল হাবুল শব্দ ক'রে হেসে উঠল। সংসারাভিজ্ঞ লোক। আমায় একনজর দেখেই সে ধ'রে ফেলল। তেমনি হেসে বলল, 'কবে গেছে তোর, ক'দিন এই হাল?'

'জুনে গেছে।' বললাম। 'আজ তিন মাস স্রেফ বসা।'

'আমার গেছে মার্চে। দে, বিড়ি-ফিড়ি থাকে তো, দে।' হাবুল আমার হাত ধরল। 'সঙ্গী পেয়েছি, এখন আর হাঁটতে কষ্ট নেই।' অর্থাৎ পুরোনো বন্ধু পেয়ে ও মহাখুশি।

নিজেদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করতে করতে দু'জন অগ্রসর হচ্ছিলাম, কয়লাঘাটা স্ট্রীটের মুখে হঠাৎ জোনাকির সঙ্গে দেখা। হ্যাঁ, সেই জোনাকি। দেখেই ও আমাদের চিনল, আমরাও চিনলাম। অপ্রত্যাশিত এই মিলন তিনজনের রাস্তার ওপর, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হৈ হৈ ক'রে উঠলাম।

আমাদের চেয়ে জোনাকি মাথায় যেমন লম্বা বেশি, তেমনি

চালাকও বেশি। আমরা 'ছাঁটাই' কথাটা প্রয়োগ করলাম, হাবুল ও আমি। জোনাকি তার অবস্থার কথা ঘুরিয়ে অন্যভাবে ব্যক্ত করল। এবার ও ঠিক একজিকিউটিভ হয়ে যেত, তা ফার্ম যদি কুপোকাত হয় তো সে করবে কি, কার দোষ!

'কালের দোষ।' হাবুল হি হি ক'রে হাসল। জোনাকির গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি ময়লা হয়ে গেছে, মাথায় টেরি গেছে ভেঙে।

'আবার বাগাব, জবরদস্ত রকমের একটা বাগিয়ে নেব, দেখিস।' বলল ও ত্থ'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি ও হাবুল দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মনে মনে বললাম, 'সেই বাগানো যত শিগ্‌গির সম্ভব হয় বন্ধু, তত মঙ্গল। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পায়ের তলা ক্ষয়ে গেছে, দেখ।'

আশা ছিল, বরাবর আমরা ধারণা করে রেখেছিলাম, চতুর ও তার্কিক জোনাকি ব্যারিস্টার হবে, অ্যাটর্নি হবে, উকিলও হতে পারে; কিন্তু ও যে শেষ পর্যন্ত চাকরিতে ঢুকেছিল, এই প্রথম শুনলাম। যাক্‌গে, পুরোনো বন্ধুদের পেয়ে জোনাকিও ভারি খুশি, লক্ষ্য করলাম। আমাদের মুখ শুক্‌নো ছিল, গালভরা পান ছিল ওর মুখে। মোড়ের পানের দোকান থেকে তৎক্ষণাৎ সুরভি জর্দা সমেত পান খাইয়ে দিলে ও আমাদের এবং ত্নজনের হাতে গুঁজে দিলে ত্নটো গোল্ডফ্লেক। অর্থাৎ হাবেভাবে এটুকু সে জানিয়ে দিলে, দিন অচল হলেও পান-সিগারেট তার চালু আছে এবং যদিও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে নাম লেখাতে এসেছে, পকেটে খুচরো খরচের আট-দশ আনা এখনো নড়াচড়া করছে। আমারও সামান্য ত্ন-চার আনা যদি বা সম্বল ছিল, হাবুলের একেবারে কিছুই নেই; অনেকক্ষণ টের পেয়েছিলাম, ফতুর, ফকির সেজে বসে আছে বেচারা।

কিন্তু তাতে কি। বন্ধু বন্ধু।

দেখলাম, জোনাকি হাবুলের হাত ধরে হাঁটতে লাগল। আশ্বস্ত হলাম। ভাল লাগল এইজন্যে যে, সুদিনে কার অবস্থা ভাল, কার

মন্দ ভেবে আমরা যেমন পরস্পর হাত মেলাতে ইতস্তত করি নি, তেমনি আজ দুর্দিনে দেখা হতে না হতে একজন আর একজনের হাত ধরলাম। জোনাকি ধরেছিল হাবুলের ডান হাত, আমি বাঁ। আলু, পটল, কন্ট্রোল, কাঁকর, প্লেগ, পারমিটের আলোচনা ঢের হয়েছে, সেগুলো বর্জন ক'রে পুরোনো দিনের সুখের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তিন বন্ধু অগ্রসর হচ্ছিলাম। বলব কি, মনে হচ্ছিল, পুরোনো আমলের সেই চায়ের দোকানের আড্ডাটি নেমে এসেছে রৌদ্রদগ্ধ কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে। তবে হ্যাঁ, তিনপায়া হ'য়ে চলছিল আড্ডা, চতুর্থ পায়া পূর্ণ হ'ল রিজিওন্যাল এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের লম্বা, ঘিঞ্জি করিডোরে এসে। মলয়! আমাদের মলয়।

তিনজন চমকে উঠলান। বুকের মধ্যে হু হু ক'রে উঠল।

অবশ্য আনন্দও যে না হ'ল মলয়কে পেয়ে, তা নয়; কিন্তু তার চেয়ে বেশি হ'ল দুঃখ।

শেষটায় মলয়ও দলে এল।

আ, কী পরিষ্কার মাথা ছিল ওর অঙ্কে! একসঙ্গে দিনরাত তাস্ খেলে, সিগারেট ফুঁকেও এত ভাল পাস করেছিল ও এক-একটা পরীক্ষায়—না, আমরা হিংসা করি নি, বরং গর্ব ছিল মনে এই ভেবে যে, মলয়ের হ'লেই আমাদের হ'ল, ও যে আমাদেরই একজন। শুনেছিলাম, কোথায় যেন ও খুব ভাল চাকরি করত। কতকাল দেখা নেই। শেষটায় সেই সোনার ছেলেও.....

'কি ব্যাপার!' তিনজন ঘিরে দাঁড়ালুম মলয়কে। 'খবর কি?'

'হুব্‌লা ব্রাদার্সে ছিলুম, ব্রাদার।' প্রথমে আমার, তারপর জোনাকির চোখে চোখে চেয়ে মলয় মলিন হাসল। 'ওই শালা এক মাদ্রাজী এসে ওপর-নিচ সব কচুকাটা ক'রে দিলে।'

'মন্দার বাজার—ঘোরতর দুর্দিন।' হাবুল হাউ হাউ ক'রে উঠল।

'ভাল-মন্দ কেজো-অকেজো কিছুই দেখলে না বেটা', মলয় বলছিল, 'তা ছাড়া, কতদিন তো হয়েছিল সার্ভিস আমার—'

'সেসব কি আর দেখে ওরা!' জোনাকি বলছিল, 'না, তুই দেখবি তোর বাড়ির মেহেদির বেড়া ছাঁটতে গিয়ে, কোন ডাল নতুন, কোনটা পুরোনো ?'

বোবার মত তাকিয়ে মলয় জোনাকির কথা শুনল।

কষ্ট হচ্ছিল আমাদের আরো বেশি এই জন্যে যে, অমন সুন্দর চেহারা, দামী স্যুট্ ও মূল্যবান মগজ নিয়েও মলয় বাতিল হয়ে গেছে, খড়কুটোর মত ভেসে এল এখানে। এখন বেলা একটা। কোথায় হুব্লা ব্রাদার্সের এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে ব'সে ও আইসক্রিম, পাকা পেঁপে,, দ্বারিকের দুটো ভাল সন্দেশ নিয়ে লাঞ্চ খেত, তা না, এখানে দাঁড়িয়ে খুঁটে খুঁটে শুক্‌নো চীনাবাদাম চিবোচ্ছে। মনে মনে বললাম, 'বরাত। সব থেকে ও অসহায়, কেন না—'

'মামাশ্বশুর বড়লোক, কলকাতায় বিখ্যাত হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট, তাঁর জোরেই ওই সোনার চাকরি। চাকরি হারিয়ে আমি বোকা হয়ে গেছি।' মলয় হতাশ চোখে আমাদের তিনজনের মুখের দিকে তাকাল।

'মামাশ্বশুরকে ধ'রে আর একটা বাগিয়ে নে।' জোনাকি বলল।

মলয় অল্প হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'শ্বশুর কি আর আছে! শ্বশুরের হ'য়ে গেছে। কারবার ফেল্ প'ড়ে তালুকদার মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, জোর-জেল্লা কিছুই নেই আজ তাঁর।'

'তবেই বোঝ।' ড্যাব্‌ডেবে চোখে হাবুল আমার দিকে তাকাল। 'লোহা-লক্কড় গ'লে-ধুয়ে এ বাজারে একাকার, আমরা কোন্ ছার।'

আমি ঘাড় নেড়ে হাবুলকে সমর্থন করি।

'সিগারেট খা।' আদর ক'রে জোনাকি মলয়ের হাতে সিগারেট

দিতে গেল। দেখি, মলয় ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখছে। মিনিটে মিনিটে চাকুরিপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। ভিড়—বেশ বড়রকমের ভিড় জমে গেছে অফিসের বারান্দায়। ভিড়ের চাপ ক্রমশ এদিকে সরে আসছে, আমাদের দিকে। লক্ষ্য করলাম।

মলয় বলল, 'দম বন্ধ হয়ে যাবে—এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমি মরে যাব, কামাখ্যাদা।' বন্ধুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ আমি। তাই আমার দিকেই ও মুখ ঘোরাল।

আরো বেশি কষ্ট লাগল। এবং ও যে একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়েছে, বেশ বোঝা গেল। বললাম, 'না, এখানে দাঁড়িয়ে কথা কি—চল, একটু ওদিকে যাওয়া যাক।'

মলয় সহ তিনজন ভিড় ছেড়ে ফাঁকার দিকে চললাম। বিশ বছর আগের কৈশোর-যৌবনের ছবি মনে পড়ল। তখন ছিল খেলার মাঠ। ফুটবল খেলা।

এটি সংসার-সমরাঙ্গন। আর খেলাও যে-সে নয়, ভাগ্য নিয়ে মানুষের জীবন। সেই খেলার দর্শকের ভিড়ের চাপ মলয়ের গায়ে না লাগে, হাতের বেড়ি লাগিয়ে তিন বন্ধু ওকে নিয়ে নতুন ক'রে যেন রাস্তায় নামলাম।

'সত্যি ব্রাদার, তিন দিনে আমি টায়ার্ড হ'য়ে গেছি।' মলয় গরম অ্যাশ্‌ফল্টের ওপর পা রাখতে গিয়ে মুখ বিকৃত করল।

'তিন দিন! কামাখ্যাদা হাঁটছে তিন মাস। আমার বছর ঘুরতে চলল।' হাবুল হাসছিল। 'তুই, জোনাকি?'

'থাক না, ওসব আলোচনা এখন!' একটু ধমকের সুরে জোনাকি বলল, 'আয়, গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিই, একটু গল্প-সল্প করা যাক।'

'সত্যি তো, কতকাল পর সব একত্র হয়েছি!' বললাম আমি।

অর্থাৎ মলয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সে সব আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে চাইলাম আমরা। হাবুল চুপ। রৌদ্রে

মলয়ের সুন্দর মুখ এরই মধ্যে আবার টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে, লক্ষ্য করলাম।

চারজন উল্টোদিকের পেভ্‌মেণ্টে উঠে একটা আতাগাছের ছায়ায় দাঁড়াই।

জোনাকি ইতোমধ্যে আর এক প্রস্থ সিগারেট বিলিয়েছে সবাইকে। হাবুল অসমর্থ, জানি। আমি, আমার পুঁজিও সামান্য, তবু তাড়াতাড়ি হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চার আনার কচি শশা কিনে ফেললাম।

না, বন্ধুর কাছে বন্ধুর লজ্জা নেই। যার যেমন সামর্থ্য, যখন যেমন সম্বল। বন্ধুকে খাইয়ে, বন্ধুর কাছ থেকে খেয়ে চিরদিন আমরা তৃপ্তি পেয়েছি, তা যত সামান্য, যত ক্ষুদ্র খাদ্য হোক।

বলব কি, কোনো এক গরমের দুপুরে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে ব'সে 'হ্যাপি-বয়' খাওয়ার মতন এই বয়সে আবার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চারজন নুন-মাখানো শশা খেতে লাগলাম।

একবার কল্পনা করুন।

চেহারা ও বেশভূষার বিচারে আমার ও হাবুলের হাতে শালপাতার ঠোঙা তবু যা হোক মানিয়ে গেছিল, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, লপেটা গায়ে জোনাকির হাতে ঠোঙাটা ঠাট্টার মত ঠেকছিল। সবচেয়ে বেশি করুণা হচ্ছিল সুশ্রী, সুছাঁদ টাই-স্যুট্ পরা ঠোঙা হাতে মলয়কে পাশে দেখে।

মনে মনে বললাম, 'উপায় কি।'

'বড্ড helpless হয়ে পড়েছি।' ঠোঙাটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মলয় একসময় বলল।

বললাম, 'মনে সাহস রাখতে হয়, অত ভেঙে পড়লে চলে!'

'এই তো সবে শুরু!' হাবুল বলল, 'লিলুয়া-হাওড়া হেঁটে হেঁটে আমার—'

হাবুল কথা শেষ করার আগে সিগারেটের আলতো ধোঁয়া ছড়ে

দার্শনিকের মত জোনাকি মন্তব্য করল, 'সময়, সময় না হলে কিছুই হবে না ব্রাদার, নইলে আমার মত তুখোড় ছেলে আট মাসেও একটা কুটো কামড়ে ধরতে পারছে না, বুঝিস না ?'

শুনল মলয়। চুপ করে থেকে একটা ঢোক গিলল।

বললাম, 'আর খবর কি তোর ?'

কিন্তু সে কথা মলয়ের কানে গেল না।

'আমি কি জানি না, খুব জানি। আর একটি যোগাড় হ'তে সে অনেক দিন। অনেক রোদে গা পোড়াতে হবে, অনেক ধুলো নাকে নিতে হবে।'

রাস্তার রৌদ্রের দিকে চেয়ে মলয় শিউরে উঠল। 'কিন্তু শোনে কে, কে বোঝায় ওকে। আজই যাও, এক্ষুনি যোগাড় ক'রে আনো।'

'কে, কে এমন অবুঝ ?' জোনাকি ভ্রূকুটি করল।

'ব্রাদার, সহস্র হাত জলের নিচে ডুব দিয়ে মুক্তো তোলা সহজ, কিন্তু সহস্র দরজায় ঢু মেরেও তুমি তিন দিনে চাকরি যোগাড় করতে পারছো না।' হাবুল রীতিমত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল।

আস্তে মলয়ের একটা হাত ধ'রে অল্প হেসে বললাম, 'কে, কে বলেছে তোকে, আজই যাও, এক্ষুনি চাই ? স্ত্রী ?'

কথা না ক'য়ে মলয় ঘাড় নাড়ল।

তিনজন চুপ ক'রে রইলাম।

মলয়ের সঙ্গে দেখা হবার একটু আগে এই আলোচনাও হয়েছিল আমাদের।

পরিবার বলতে হাবুলচন্দ্র বিগতদার। তা হলেও গ্যাস্‌ট্রিক আল্‌সারে পঙ্গু বড় ভাই আছেন ওর মাথার ওপর বৃহৎ পরিবার নিয়ে। সেই জন্যেই ও নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। আমি, বিগতদার না হলেও, বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না অছিলায় দারাকে দিন-কতক দূরে ঠেকিয়ে রেখেছি, মানে লাম্‌ডিঙে ওর বাপের কাছে

পাঠিয়ে কোনরকমে এ সময়টায় নিশ্বাস ফেলছি। জোনাকি অবশ্য চিরকালই চালাক। বিয়ে করে নি ওই বয়সেও। ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, স্পেকুলেশন নিয়ে ব্যস্ত। তবে বুড়ো বাপ-মা আছেন, অপোগণ্ড একটা ভাই আছে। ওদের জন্যে ভাবনা।

তা হলে বেশ বোঝা গেল, মলয়ের মত অবস্থা আমাদের কারোর না। অর্থাৎ অনবরত কেউ পেছন থেকে তাড়া করছে না, ঠেলা মারছে না, আজই চাই, এক্ষুনি হোক্। যা নিতান্তই অসম্ভব।

'আর কি বলছে বৌ?'

এক চোখ ছোট ক'রে জোনাকি একসঙ্গে অনেকগুলো ধোঁয়া ছাড়ল।

'দারুণ ক্রাইসিস। রাতারাতি জব্ পাওয়া মুশকিল, স্রেফ বলে দিবি গিন্নীকে।'

'হুঁ, যদি এতকাল সুখ ক'রে থাকেন, দিনকতক এখন দুঃখ ভোগ করতেই হবে।' হাবুল মলয়কে বোঝাল। 'বৌদিকে বলবি, মাছ-ডিম কিছুকাল বন্ধ থাকবে। বিউলির ডাল আর ডাঁটা-শাক চলুক এখন থেকে দু'বেলা।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'মুখে তো বিশেষ কিছু বলছে না, বলছে ওর ভুরু দুটো। উঃ, আমার চাকরি যাওয়ার দিন থেকে তোমরা কেউ যদি মঞ্জুর চেহারা দেখতে!' মলয় অসহায় চোখে তিন বন্ধুর চোখের দিকে তাকাল।

'দুই ভুরুর মাঝখানটা বুঝি সুয়েজ খাল হয়ে আছে?' জোনাকি মঞ্জুর বিরক্তিব্যঞ্জক মুখটি বর্ণনা করল।

মলয় মাথা নাড়ল।

'বলছে, এখন বাড়িভাড়া বন্ধ হবে, খুকুর দুধ বন্ধ হবে, আমার গয়না বাঁধা পড়বে।' মঞ্জু মুখে কি বলছে, মলয় বলল।

'মুশকিল! এ ব্যাপারে মেয়েদের এমন অস্থির হ'লে চলে?' আমি মন্তব্য করলাম।

'হৃদয়হীন।' হাবুল ফোঁস্ ক'রে উঠল।

'আমার সঙ্গে কথা বলছে না, কথা বন্ধ করেছে ও, যেদিন শুনল, আমার চাকরি গেল।' বলতে বলতে মলয় প্রায় কেঁদে ফেলল।

সেই ড্যালহৌসি। বেলা তখন দু'প্রহর। একমাত্র আমরাই বুঝলাম, দেখলাম, বাড়িতে কি অশান্তি যাচ্ছে বন্ধুর। অথচ, ওর জুতোটি এখনও চমৎকার চক্‌চক্ করছে, সুন্দর টাই, পরিচ্ছন্ন শার্ট ও প্যান্টলুন। অর্থাৎ আজই, এখনই এমন অভাব আরম্ভ হয় নি নিশ্চয় মলয়ের যে—

'চ—আমরা যাই, আমরা গিয়ে তোর বৌকে বোঝাই।' জোনাকি এক চোখ ছোট ক'রে মলয়ের দিকে তাকাল।

'আমার সঙ্গে মঞ্জু আজ তিন দিন কথা বলছে না, তোমরা আইডিয়া করতে পারো, জোনাকিদা?' মলয়ের দুই ঠোঁট ভয়ানক কাঁপছিল।

আমি বললাম, 'সুখের সময় মানুষকে বোঝা যায় না। দুঃখের দিনেই হৃদয়ের পরীক্ষা হয়। পেশেন্স্, টলারেশন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে স্বামি স্ত্রীর জীবন সুখের হতে পারে না। বুঝিয়ে বলবি।'

'বাচ্চা ক'টি?' জোনাকি গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল।

'একটি, একটা বেবি। ওই নিয়ে কত কথা শুনতে হচ্ছে আমায়।' ব'লে মলয় একঝলক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'অর্থাৎ ওদিকেও আমাদের বৌদি কড়া।' ড্যাব্‌ডেবে চোখে হাবুল আমার দিকে তাকাল।

'বিয়ে করেছিস ক'দিন?' জোনাকি আবার প্রশ্ন করল।

'চার বছর', বলল মলয়।

'উঁহু, মর্জিমত ছেলে হওয়া না-হওয়া চলে ব্রাদার, চাকরি হওয়া

চলে না, তোমার মিসেস্‌কে বলে দিও।' হাবুল এবার কেমন গজগজ ক'রে উঠল।

'তোর বাসা কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বৌবাজার।' আঙুল দিয়ে বৌবাজারের দিকটা দেখিয়ে মলয় প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল। 'কাছেই, হেঁটে যাওয়া যায়, একদিন এসো না সব।'

একেবারে নিঃসঙ্গ। মানে বড় হবার পরও বিয়ে ক'রে, সংসারী হ'য়েও মলয় আমাদের ছেড়ে নিতান্ত একলা পড়ে গেছে, চেহারা দেখে বেশ বোঝা গেল। সামলাতে পারছে না বেচারা।

ছোটবেলায় ছোটখাটো বিপদে ও আমাদের অনেক সাহায্য চেয়েছে, পেয়েছে। আজ বড়রকম বিপদে ঠিক সাহায্য না হ'লেও সান্ত্বনা ও সাহসের জন্যে যে ও তিন বন্ধুর মুখের দিকে তাকাবে, যেন জানা ছিল না।

হেসে বললাম, 'বেশ তো, এমনি তো বৌকে গিয়ে একদিন আমাদের দেখে আসা উচিত, কি বলিস জোনাকি! আজই যাওয়া যাক।'

'খালি হাতে?' হাবুল বলছিল।

'সে হবে।' জোনাকি সংশোধন করল। 'আবার যেদিন সুদিন হবে, সেদিন না-হয় ভরা হাতে গিয়ে বৌ দেখা যাবে। রোদে ঘুরে ঘুরে হয়রান সব। তবু যা হোক মলয়ের বাসা কাছে, আড্ডা দেবার একটা জায়গা হ'ল।' কথার শেষে জোনাকি আমাদের মুখের দিকে তাকাল।

'সেই ভাল', বললাম। 'তা ছাড়া, আজ যাচ্ছি ওর বৌকে দুটো কড়া কথা শোনাতে, বোঝাতে যে, যদি তুমি এমন অবুঝ হও বৌদি, তো মলযকুমার—'

'ঠিক কথা।' আমার কথা শেষ হবার আগে হাবুল হাঁকল, 'বাইরের অশান্তি সওয়া যায়, ঘরের অশান্তি বড় সাংঘাতিক—'

'এসো, তোমরা এসে ওকে দেখিয়ে দাও, সংসারে আজ আমি একলা বেকার নই, আরো পুরুষ আছে, স্বামী—' মলয় উত্তেজনায় কাঁপছিল।

'পুরুষকার ঠেস দিয়ে কথা বলছে বুঝি?' জোনাকি প্রশ্ন করল।

ঘাড় নেড়ে মলয় প্রশ্নের উত্তর দিল।

ট্রাফিক এড়িয়ে মলয়কে নিয়ে সন্তর্পণে ক্রসিং পার হ'য়ে তিনজন বৌবাজারের রাস্তা ধরলাম।

'যাই বলিস কামাখ্যা', বেঁটে ঘাড় ঘুরিয়ে হাবুল আমায় বলছিল, 'আজকালকার মেয়েছেলের বাড়াবাড়ি এসব,—পুরুষকার।'

'না, মলয়ের একটু শক্ত হওয়া উচিত', জোনাকি মন্তব্য করল, 'অন্তত কটা দিন—'

আমি বললাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা যাচ্ছি তো এইজন্যে। বোঝালে মঞ্জু খুব বুঝবে। দিনকাল এখন বড্ড খারাপ। গৃহিণীর এমন অসহিষ্ণু হ'লে চলে না।'

মলয় শুনল।

সারা রাস্তা বন্ধুদের কথা শুনল আর চুপ ক'রে রইল। অর্থাৎ আর যেন তার কিছু বলার দরকার ছিল না। মঞ্জু সম্পর্কে সব বলা হ'য়ে গেছে, মঞ্জুর মামলা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে ও খালাস।

মঞ্জুকে নিয়ে এবার আমাদের বোঝবার পালা।

মলয় বলল, 'বাঁ দিকে এসো।'

আমরা মলঙ্গা লেনের মধ্যে ঢুকলাম।

আ, কি বলব, কাকে বলব। কে বিশ্বাস করত, কাকে আমরা বিশ্বাস করাতাম, যদি না সেদিন—

বস্তুত, মঞ্জুকে দেখেই আমাদের মনে হ'ল, মলয় মিথ্যাবাদী। মলয়ের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমরা ঘোর অবিচার করেছিলাম এতক্ষণ মেয়েটির ওপর।

এই এতটুকুন, একটা পাখির মতন, ছায়ছোট্ট, ছটফটে, হাসি-খুশি, মিষ্টি চেহারার মঞ্জু। চশমা চোখে। মাথায় প্রচুর চুল নেই, কি মাথাটি তেমন বড় নয় ব'লে খোঁপা করা হয় নি, কুমারী বয়সের বেণী র'য়ে গেছে।

আর তাতেই আরো বেশি আনাড়ি, অপটু ঠেকছিল। যেন নতুন ঝক্‌ঝকে ছোট ফুটোওলা একটা ঝিনুকের বোতাম, খাপ খাওয়াতে পারছে না, আটকাতে পারছে না কিছুতে—মলয় নামক একটি বড় ওভারকোটের গায়ে। খ'সে পড়ছে, ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

বেশি ঝক্‌ঝকে মনে হচ্ছিল মঞ্জুকে—সারাক্ষণ পাকা ডালিম-দানার মতন গোলাপী-লাল মাড়ি বার ক'রে ও হাসছিল ব'লে।

হ্যাঁ, মঞ্জু, সেই মঞ্জু। এমন ছুটোছুটি ক'রে আদর ক'রে তিনজনকে ঘরে তুলল, লাল মেঝেয় সুন্দর সুজনি বিছিয়ে বসতে দিল, তারপর পরিচয় জানবার আগ্রহে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল মলয়ের দিকে যে, আমরা কিছুতেই কেন জানি, বিশ্বাস করতে পারি নি, মঞ্জুর ভয়ে মলয় সারা হ'য়ে যাচ্ছিল, চাকরি গেছে-না-গেছে, পরদিন থেকে মেয়ে ধমকাচ্ছে স্বামীকে। অপটু। অনভিজ্ঞ। মঞ্জু যে অনেক বেশি অপটু।

বলব কি, বলতে বাধা নেই যদিও, মঞ্জুর কোলে মলয়ের ছেলেটাকে পর্যন্ত আমাদের চোখে কেমন বড় বড় ঠেকছিল। হ্যাঁ, বহরে বড়।

ছোট্ট শরীর নিয়ে মঞ্জু সামলাতে পারছিল না খোকাকে, খোকাও বেশ কিছুক্ষণ ইলিবিলি ক'রে শেষ পর্যন্ত বাপের কোলে, মানে মলয়ের কোলে উঠতে পেরেই ঠাণ্ডা হ'ল, লক্ষ্য করলাম।

দেখে মঞ্জু যেমন হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, আমরা তিনজনও হাল্কা বোধ করলাম।

আগন্তুকদের পরিচয়।

মলয় পরিচয় দেবার আগেই মঞ্জু তিনজনের পরিচয় আদায় ক'রে নিল।

'আমি কামাখ্যা চক্রবর্তী, ইনি হাবুল হালদার, উনি জোনাকি সেন।' বললাম, 'আমরা মলয়ের বাল্যবন্ধু, অবিশ্যি বয়সে ও আমাদের কিছু ছোট।'

মঞ্জু নমস্কার করল।

'আমি আপনাদের বন্ধুপত্নী মঞ্জুমায়া।' দু হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রত্যেককে আলাদাভাবে মিনতিভরা নমস্কার জানাল মলয়-গিন্নী।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

যেন টের পাচ্ছিল মলয়।

সুজনির এক ধারে হাল্কা হাঁটু দুখানা মুড়ে মুখোমুখি হয়ে ব'সে মঞ্জু চোখের পলকে যখন আলাপ জুড়ে দিল তিনজনের সঙ্গে, মলয় বেশ বুঝতে পারল, রাস্তায় ও যে নানারকম কথা বলছিল, নিন্দা করছিল বৌ কী নিষ্ঠুরা, হৃদয়হীনা ব'লে, বন্ধুপত্নীর সাক্ষাৎ দর্শনের পর বন্ধুরা তা আর এখন একবর্ণ বিশ্বাস করবে না। লজ্জায় অধোবদন হয়ে চুপচাপ ঘরের এক কোণায় একটা বেতের মোড়ার ওপর ব'সে ছেলেকে আদর করতে, ছেলের মুখে চুষিকাঠি গুঁজে দিতে ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেখলাম।

আড়চোখে মলয়কে দেখতে দেখতে তিনজন ভাবলাম, তবু ভাল, ও যে ঘরে এসে বৌকে আর উচ্চবাচ্য করছে না।

কে বিশ্বাস করে, বলুন, কেউ যদি বলে, যুঁইফুলের পাপড়ির ধারে হাত কাটে, চাঁদের আলোয় গা পুড়েছে?

এই মিষ্টি মেয়ের কথায় এককোঁটা ঝাঁঝ নেই। জিভ থেকে কথা ঝরবার আগে হাসি ঝরছিল।

ওর চোখা বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে মলয় গরমে, ধুলোয় চাকরির চেষ্টায় ডালহৌসি চষছিল তিনদিন ধ'রে, ঘরে ফিরতে ভয় পাচ্ছিল বৌ বক্‌বে ভয়ে! মলয় মিথ্যাবাদী। মঞ্জুর ব্যবহারই তা আমাদের ব'লে দিল।

ওর স্বামী ছাড়াও জলজ্যান্ত আরো তিনটে বেকার ঘরে উপস্থিত ছিলাম। জোনাকির বা আমার না হোক, হাবুলের বেশবাস দেখেই তা বোঝা যায়।

শেষবার হাবুলের যখন পান খেতে ইচ্ছা হয়েছিল, মোড়ের কাছে হঠাৎ পরিচিত পানের দোকান পেয়ে ও নাকি ধারে এক পয়সার পান কিনতে গেছিল। দোকানী হাবুলকে মাছি তাড়ানোর মত ফিরিয়ে দিয়েছিল। অথচ দশ বছর ধ'রে চাকরি হওয়ার দিন থেকে হাবুল ওর দোকানে রোজ দু আনার ক'রে পান খেয়ে এসেছে।

গল্পটা মুখে মুখে বলছিল হাবুল আসবার পথে। উড়ে দোকানীর দোষ কি, আমার এই চেহারা ও বেশভূষা দেখলে বেঁচে থাকলে গিন্নীই তেড়ে মারতে আসত। তোর তো বাবা দেখছি, পায়ে জুতো থাকবে না দূরে থাক, মাথায় একগাছি চুল এদিক-সেদিক হয় নি এখনো, এর মধ্যেই বৌয়ের এত উত্তেজনা, হাঁসফাঁস? ভাল না।' হাবুল মলয়কে বোঝাচ্ছিল রাস্তায়। 'আমার অবস্থা যেদিন তোর হবে, সেদিন দেখছি বৌ তোকে—'

অর্থাৎ হাবুল মঞ্জু সম্পর্কে একটা মারাত্মক মন্তব্য করেছিল। আপত্তি করার মতন।

এখন দেখা গেল, কোথায় সেই মঞ্জু, আর কোথায় এই মঞ্জু। আকাশপাতাল তফাত। মলয়ের বর্ণনার সঙ্গে একবিন্দু মিল নেই।

বরং আমরাই লজ্জিত হলাম।

জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছছিল হাবুল, ছুটে গিয়ে হাতপাখা নিয়ে এল মঞ্জু। জোনাকি সিগারেট ধরাতে মলয়ের অ্যাশ্‌ট্রে

টেনে ওর পায়ের কাছে রাখল মঞ্জুমায়া, তারপর হাল্কা সোনার রঙের পা দুখানি মুড়ে আগের চেয়েও ঘন হয়ে বসল সুজনির ওপর। হাসতে হাসতে বলল, 'শুধু মুখে আড্ডা জমবে কি! তাস, লুডো একটা কিছু হ'লে দুপুরটি কাটত বেশ।'

যেন বহুদিন পর গায়ে বসন্তের হাওয়া লাগল।

বলছিলাম, ক'জনের বৌ একথা বলে এদিনে।

বেকার স্বামীর বেকার সব বন্ধু।

সব জেনেই বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলার দিবাস্বপ্ন জেগেছিল মঞ্জুমায়ার।

বেকারদের বেকার, অকেজো ক'রে দেখতে নেই, তারা তাতে চটে যায়, দুঃখ পায়, এই গূঢ় তত্ত্ব জানে মঞ্জুমায়া। যুঁইফুলের মত সব ক'টি দাঁত বের ক'রে ও হাসল, অর্ধেক দৃষ্টি স্বামীর দিকে রেখে অর্ধেক আমাদের দিয়ে বলল, 'অঙ্ক ক'ষে ক'ষে আপনাদের মলয়বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কি রকম, কি রকম।' আমরা আড়চোখে মলয়কে আর একবার দেখলাম। 'কি বলছিল ও?'

'তিনদিনেই ও চাকরি খুঁজে নেবে। আমি বলছি, তিন মাস। তিনটি মাস তোমায় রোদে রোদে সাঁতার কাটতে হবে। দুটো দিন সবুর করো। মন খারাপ ক'রে, মাথা খারাপ ক'রে এখন থেকেই অত ছুটোছুটি করলে শরীর টেঁকে ক'দিন। অসম্ভব রোদ বাইরে। ঘরে থেকেই আমার চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে।' বাইরের দিকে এক চোখ আর একটি চোখ ঘরে, মানে আমাদের বন্ধুদের মুখের ওপর মেলে ধরল মঞ্জুমায়া। 'সত্যি কিনা?'

মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মলয় চুপ।

চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় ছিল কি ওর।

কিন্তু শেষ অবধি চুপ করেও ছিল না। আবার ভুল করল।

ভুল নয় অবিচার, মঞ্জুর ওপর তো বটেই, আমাদের ওপরও। ঘরের সুন্দর আবহাওয়াটাই ভেঙে দিলে ও। বেকার হবার পর থেকেই জোনাকি এক প্যাকেট তাস পকেটে নিয়ে ঘুরত। কি জানি, যদি এমন একটি আড্ডা পাওয়া যায়, বন্ধুরা তো বটেই, সেখানে বন্ধুপত্নীও এক-আধজন থাকবেন।

এবং ভেবে অবাক হচ্ছিল ও, সত্যি এমন কোনো বন্ধুর গিন্নী কি এ বাজারে আদৌ পাওয়া যাবে, যিনি স্বামীর চাকরি গেছে জেনেও মুখ গোমড়া না ক'রে হাসছেন, ভেঙে নুয়ে না প'ড়ে রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো সুন্দর শক্ত থেকে মাথা তুলে আছেন।

'আশা আলো দুঃসময়ের সাথী বলতে স্ত্রী ছাড়া পুরুষের কে আর আছে, বলুন।' বিয়ে না ক'রেও বিবাহিতের মত সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথাগুলো বলছিল জোনাকি, আর তাসের প্যাকেটটি মঞ্জুমায়ার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় বোকা মলয় কথা ক'য়ে উঠল। 'এঁদের একটু চা-টা ক'রে দিলে হ'ত না?'

একজোড়া আহত কালো চোখ আমাদের মুখের ওপর পাখা মেলে ধ'রে চুপ ক'রে রইল। একটু পরে মঞ্জু এক সময়ে মলয়ের দিকে মুখ ফেরাল। 'একফোঁটা দুধচিনি ঘরে নেই।'

'তা বলতে হয়, না বললে আমি জানব কি ক'রে, তোমার ভাণ্ডারে চায়ের দুধচিনিরও টান ধরেছে।' তেরছা চোখে মলয় বৌয়ের দিকে না তাকিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, যেন বন্ধুদের সমর্থন খুঁজছিল ও তার নিজের কথার জন্যে।

আমরা চুপ ক'রে থাকি নি। তিনজন সমস্বরে গর্জন ক'রে উঠলাম। 'তুই থাম, তুই চুপ কর, গাধা।'

'বেশি প্র্যাক্‌টিক্যাল হয়েছিস্‌, না?' জোনাকি বলছিল।

'ঘরে বন্ধু এলেই চা দিতে হবে, তার কি অর্থ আছে।' হাবুল বলল।

'এসব পাট তুলে দে দিনকতক ; বাজার বড় খারাপ।' আমি মলয়কে বোঝালাম।

'আমরা এসেছি বৌদির কাছে, তোর কাছে আসি নি।' জোনাকি বোঝাল। 'তুই তোর ছেলেকে আদর কর ততক্ষণ, একটা রাবার শেষ করি আমরা। আসুন বৌদি।'

কিন্তু যে কথা বলা হয়েছে, যে ঢিল ছোঁড়া হয়েছে, তা আর ফিরিয়ে নেয় কে।

ঢিলের ঘায়ে ভেঙে না পড়লেও নুয়ে গিয়েছিল রজনীগন্ধার ডাঁটা। নতমুখী মঞ্জুমায়া।

ঘরময় স্তব্ধতা। মলয়ের ছেলের চুষিকাঠি চোষা ও অদৃশ্য একটা টাইম্‌পিসের টুক্‌টুক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না তখন।

'যাক, যা হবার হয়েছে', অতল লজ্জা থেকে মঞ্জুমায়াকে টেনে তোলবার জন্যে সকলের আগে হাত বাড়াল জোনাকি। পকেট থেকে একটা দু'আনি তুলে মলয়ের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এর বেশি আমার সঙ্গে নেই, ওই দিয়ে যতটা হয় দুধচিনি চট্ ক'রে তুই নিয়ে আয়, মলয়।'

আমি বার করলাম একটা আনি। শশা কেনার পর ঐটেই পকেটের এক কোণায় থেকে ধুক্‌পুক্ করছিল।

পর্যন্ত হাবুল। অবাক হ'য়ে গেলাম দেখে, ছেঁড়া কোটের কোন অংশ থেকে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা ডবল পয়সা বার করল ও। করতে পারল।

'যা, আর দেরি করিস নে।' মলয়ের দিকে পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে হাবুল বলল, 'ওই দিয়ে যা হয়, নিয়ে আয়।'

পয়সা কুড়িয়ে মলয় সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখে অল্প হাসি। 'সত্যি ব্রাদার, ভারি লজ্জা করছে আমার। এখানে, মানে আমার বাড়িতে এসে আজ তোমরা—'

'নে, আর ন্যাকামো করতে হয় না।' হাবুল ধমক দিল, 'যা বলছি, আগে তাই কর্।'

'লাস্ট স্যালারি মুদির বিল আর বাড়িভাড়া মেটাতে গিয়ে—'

'সে আমরা জানি। পরিবার আমাদেরও আছে, বাড়িভাড়া মুদির বিলের আওয়াজ রেখে তুই বেরিয়ে পড়। ধারে কাছে দোকান পাবি তো?'

জোনাকির মুখের দিকে চেয়ে মলয় ঘাড় নাড়ল। 'তাস শাফ্‌ল ক'রে তোমরা শুরু ক'রে দাও।'

'সে আমরা জানি, আমাদের খেলা আমরা বুঝব।' মলয়ের ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে জোনাকি মঞ্জুমায়ার মুখের দিকে তাকাল। 'কই, এসো বৌদি।'

রজনীগন্ধা ঘাড় সোজা করল।

'একেবারে নাবালক।' বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আমিই মঞ্জুকে বোঝালাম, 'মলয়টা আর বড় হ'ল না।'

'যাক্‌গে, আমরা যখন এসে পড়েছি, বৌদির আর কষ্ট নেই।' হাবুল জোরে জোরে পাখা চালাল।

জোনাকি বলল, 'তুমি আরো সামনে এসো, মঞ্জু।' মলয়ের জুতোর শব্দ বাইরে মিলিয়ে যায় নি তখনো।

একটু পরে শুধু দুধচিনি নয়, একটা দেশলাই, এক পাতা চা নিয়ে মলয় ঘরে ঢুকল।

আমরা গম্ভীর, কেউ আর মুখ তুলি নি তখন।

খেলায় মত্ত, তথাপি হাবুল থুঁতনি তুলে বলল, 'যা বাবা, চট্ ক'রে একটু জল ফুটিয়ে নিয়ে আয়।'

'সে আমি পারব, তাতে আর কষ্ট কি।' বুদ্ধিমান মলয়, মস্তিষ্ক-ভাল মলয় ঈষৎ হেসে উত্তর করল, 'তা ছাড়া, তোমাদেরটাই তোমরা খাচ্ছ; এটুকুন যদি আমি না করলাম, তো বন্ধু হলাম কি। এখুনি চা ক'রে নিয়ে আসছি।'

'সাবাস, সাবাস!' আমরা চিৎকার ক'রে উঠলাম।

অর্থাৎ মলয়ের ওপর তিলমাত্র আর রাগ ছিল না কারো। তাস থেকে মুখ তুলে আড়চোখে জোনাকির চোখের দিকে চেয়ে মঞ্জুমায়া হাসছিল, হাসির ধমকে একটু একটু কাঁপছিল ও। আলতো হাওয়ায় ফুলের ডাঁটা যেমন কাঁপে।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা পাঁচজন মলয়ের মলঙ্গা লেনের কামরায় কমতেজী বাল্‌বের মন্দ আলোয় ব'সে ঠিক ক'রে ফেললাম।

প্রস্তাব তুলেছিল মঞ্জুমায়া।

পরীক্ষার খাতায় মলয় ফি বার অঙ্কে ফুল-মার্ক পেয়েছিল, কিন্তু সংসার খরচের নির্ভুল হিসাব বার ক'রে দেওয়া—

মঞ্জুমায়া পিছনে না থাকলে এতটা ব্যুৎপত্তি মলয়ের জন্মাত না, ভাবলাম।

মুখে মুখে হিসাব করল মলয় ও মঞ্জু। দেশলাই বাদ দিয়ে এগারো পয়সায় পাঁচ পেয়ালা চা। আর সেই চায়ের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের তুলনা ছিল না।

সুতরাং মঞ্জুর প্রস্তাবে আমাদের গররাজি হবার কোনো কারণ ছিল না। কেনই বা থাকবে, বলুন।

দু মাসের টাকা বাকি, হোটেলের মালিক আমায় আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল রোজ। এত বড় পরিবারের খোরাক যোগানো দূরে থাক গ্যাসট্রিক আল্‌সারের রোগী বড়দার জন্যে এক ফাইল স্টমাক পাউডার কিনে দিতে পারছিল না বলে হাবুল কদিন ধরে বাড়ি ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না। জোনাকি বিলে বিলে জগৎ-সংসার অন্ধকার দেখে বুড়ো বাপ ও ছোট ভাইয়েয় সামনে মুখ দেখানো বন্ধ করেছিল সাতদিন। এতক্ষণ চেপে রাখলেও মঞ্জুমায়ার কাছে সে কথাটা চাপতে পারল না।

'কিছু না। ক্রাইসিস কেটে যাক, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' মঞ্জু অভয় দিলে। 'দিনকতক এমনি কাটুক, মন্দ কি।'

মলয় বললে, ‘আমার ঘর ছোট, কিন্তু তোমরা তো পর নও, ব্রাদার। এক খাটিয়ায় চারজন রাতের পর রাত শুয়ে গল্প ক’রে কাটিয়েছি, মনে নেই ?’

‘আলবৎ মনে আছে, মনে না থাকলে তোর ডেরায় আমরা ছুটে আসব কেন ?’ গদগদ গলায় হাবুল বলল।

আমি বললাম, ‘সময় আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল, কিন্তু মঞ্জুমায়া আমাদের এক ক’রে দিলে।’

‘তা তোমরা বলতে পার’, যেন ঈষৎ ঈর্ষায় গলার স্বর সরু ক’রে মলয় কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে বলল, ‘কিন্তু আমি ঠিক চালাব, এই হিসাবমত সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে পারব, দেখো।’

‘তোর হিসাবের ওপর আমাদের কোনদিন অশ্রদ্ধা নেই।’ তিনজন একসঙ্গে জানিয়ে দিলাম।

বলব কি, সেদিনের পর থেকে আজ একটি মাস পার হয়েছে। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে মলয় আমাদের চালিয়ে নিচ্ছে। চালিয়ে নেওয়া ছাড়া কি !

বড়বাজারে এক মেড়োর গদিতে একঘণ্টা ইংরেজী চিঠি টাইপ ক’রে ক’টাকা আমার রোজগার হয়, বলুন। হাবুল কোথায় একটা ট্যুইশনি ক’রে পনেরোটি তন্‌খা পাচ্ছে। জোনাকি ক্যানিং স্ট্রীটের এক দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক’রে টুকিটাকি জিনিসের দালালী করছে। এই।

অর্থাৎ আলাদাভাবে এই আয়ে আমাদের এক-একজনের দু’বেলা জলখাবার জুটত, ভাত জুটত না। অথচ এখানে একসঙ্গে বেশ চলছে।

রোববার, বিকেল পাঁচটা বাজে, মঞ্জুমায়ার গা ধোয়া হয়ে গেছে, চুল বাঁধছে ; কাপড়-চোপড় প’রে জোনাকি, হাবুল ও আমি

অপেক্ষা করছি। সিনেমায় যাব মঞ্জুকে নিয়ে। মলয় একটু আগে মাংস নিয়ে এসেছে বাজার থেকে, ছেলে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে ব'সে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে। এ ঘরে এসে একবার ও বলছিল তখন, 'পারব, খুব পারব আমি, দেখো। ফিরে এসে তোমরা গরম গরম মাংস-পরোটা খাবে।'

আমরা কিছু বলিনি। আমাদের হয়ে মঞ্জু উত্তর দিয়েছে। 'না পারার আছে কি, মন শক্ত করলে পৃথিবীতে কে কি না করতে পারে।'

চুল বাঁধা শেষ ক'রে মঞ্জুমায়া চোখে কাজল বুলোচ্ছিল। শিস দিতে দিতে জোনাকি বলল, 'তুমি আর দেরি ক'রো না মঞ্জু, চট্ ক'রে সেরে নাও।'

সোনার স্মৃতি

নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র, অতিরিক্ত দুটো জামাকাপড় একটা সুটকেসে ঢুকিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। আশ্বিনের শুরু। ট্রেনে চেপে জানালার বাইরে শান্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। দূরে স্তব্ধ শাদা মেঘখণ্ডের ওপর চোখ রেখে মনে মনে বললাম, কী দরকার ছিল। আমি তো প্রায় ভুলে গিয়েছি। এই এক বছরে একটা মুখ আমার মনের সামনে কবার উঁকি দিয়েছে তার হিসাব নিয়ে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে কি? যাবে না। কেননা যা অপ্রিয় যা অসুন্দর তাকে কে-ই বা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। আমি রাখিনি, ইচ্ছে করেই রাখিনি।

কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জি ভুলবেন কি করে? সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গদির ওপর আধশোয়া হয়ে বসে চিন্তা করতে লাগলাম। তিনি মা। তিনি গর্ভধারিনী। তাঁর অন্তরাত্মা ক্রমাগত পুড়ছে। এক বছরে বুকের জ্বালা আরো যে শতগুণ বেড়ে যায়নি, আমি তৃতীয় ব্যক্তি তা কী করে বুঝব। হায়রে স্নেহ, হায়রে ভালবাসা!

প্যাণ্টের পকেট থেকে এন্‌ভেলাপটা খুলে চিঠিটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরলাম: 'আমাদের একবার দেখতে কি আপনার ইচ্ছা করে না? কলকাতা থেকে মধুপুর তো খুব বেশি দূর নয়। আমরা আশা করেছিলাম গরমের সময় একবার এখানে বেড়াতে আসবেন। না, গরমকালটা অবশ্য মধুপুর ভাল না। শীতকাল সুন্দর, বসন্তকাল উত্তম। পলাশ আর মহুয়ায় মধুপুরের আকাশ রঙীন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, আমরা আপনাকে এখানে রঙ দেখতে ডাকছি—ডাকছি এজন্যে যে আমাদের চোখের দিকে মুখের দিকে

তাকিয়ে অহেতুক বেদনায় কাতর হয়ে আপনি মুহ্যমান হয়ে প্রবাসের কটা দিন কাটাবেন আমরা তা সহ্য করতে পারব না। কাজেই সুন্দর ঋতুতে আসুন—যেন আমাদের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এখানকার আকাশ, এখানকার গাছপালার দিকে তাকিয়ে আপনি কতক্ষণের জন্য, অন্তত কিছু সময়ের জন্য সহজ নিশ্বাস নিতে পারেন, স্বাভাবিক হতে পারেন। সাধারণ চিঠি লিখতে বসে অনেকটা আবেগ প্রকাশ করে ফেললাম। মার্জনা করবেন। ইতি—মিসেস চ্যাটার্জি।'

আমরা, আমরা! আমি একা নই। আর এক জন আছে। আমার মতন আর একজনের আত্মা অহর্নিশি পুড়ছে। আর এক জোড়া চোখ শ্রাবণ আকাশের অন্ধকার নিয়ে বেদনায় গাঢ় হয়ে আছে।

সেই বেদনায় নীল মুখখানা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। মিসেস্ চ্যাটার্জিকে একবার দুবার দেখেছি। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূর মুখ আমার মানসপটে একেবারে অনুপস্থিত। অসিতের কাছে কোনো-দিন স্ত্রীর মুখের বর্ণনা শুনিনি। অবশ্য আমার পক্ষে শুনতে চাওয়ার বাধাও যথেষ্ট ছিল। আমি শিক্ষক সে ছাত্র। আমি পঞ্চাশের প্রান্তে উপনীত বৃদ্ধ। অসিত? চব্বিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল কি? নববিবাহিত যুবক সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য-জীবনের কতটা রঙ গন্ধ আমার মেডিকেল স্কুলের হস্টেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে জানতে আমার কৌতূহল যে না হত তা নয়—কিন্তু অসিতের মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে যেতাম। কেমন যেন একটা ভয় হত আমার। অনিশ্চিত আশঙ্কায় বুক দুরদুর করত। অবশ্য আমার আশঙ্কা পরে সত্যে পরিণত হল। কিন্তু তখন বুঝিনি। বুঝতে চাইনি। ছুটির কদিন মধুপুরে কাটিয়ে রাত্রের ট্রেনে সে কলকাতায় ফিরেছে। সকালে দেখা করতে গেছি হস্টেলে। অসিত খাটের ওপর বসে দাড়ি কামাচ্ছে। কখন এলে? তোমার শরীর সেখানে

ভাল ছিল? তোমার মা আছেন কেমন—হুঁ, মিসেস চ্যাটার্জি? গুনে গুনে তিনটে প্রশ্ন করে পঞ্চাশের প্রান্তবর্তী বৃদ্ধ শিক্ষক ছাত্রের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তা-ও খুব বেশি কি? বিয়ের পর বার তুই অসিত তার মার কাছে গেছে। স্ত্রীর কাছে গেছে বলব না। কেননা বিয়ের পর একটা বছর অসিত তার স্বভাবের, তার রুচির, তার দৃষ্টিভঙ্গীর, তার জীবনযাপনের যে কলঙ্কময় ইতিহাস রেখে গেছে তা মনে হলে আমার ভাবতে কষ্ট হয় আদৌ সে বিয়ে করতে চেয়েছিল বা বিয়ে করে স্ত্রীকে দেখতে যেতে একদিনও তার মন ছটফট করত। হ্যাঁ, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মিঃ চ্যাটার্জির চিঠি নিয়ে প্রথম যেদিন তাঁর প্রিয়দর্শন পুত্র কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল সেদিনই আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমার এলাহাবাদের পুরাতন বন্ধু মিঃ চ্যাটার্জি। চাকরি থেকে রিটায়ার করে তাঁর মধুপুরের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন শুনে মনটা বেদনায় ভরে উঠেছিল। দুহাতে অসিতকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, কিছু ভাবতে হবে না, আমার স্কুলে ভর্তি করে নিচ্ছি তোমাকে। আমাদের হস্টেলে থাকবে। বলতে কি, মেডিকেল স্কুলের প্রথম বছরই অসিতকে ফ্রী স্টুডেন্টশীপ পাইয়ে দিতে আমাকে বেশ একটু কষ্ট করতে হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুর ছেলেকে নিজের ছেলে মনে করে সেই কষ্ট গায়ে মাখিনি। অসিত যে বছর মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয় সে-বছরই মিঃ চ্যাটার্জি মারা যান। লাইফ ইন্সিওরেন্সের কিছু টাকা আর মধুপুরের বাড়িটা রেখে গেলেন, তাই পরিবারটা টিঁকে রইল।

হ্যাঁ, অসিতকে আমি নিজের ছেলের মত ভালবেসেছিলাম। মাসে দুবার আমি মিসেস চ্যাটার্জির কাছে চিঠি দিতাম: 'আপনার ভাবনার কিছু নেই। আমার তত্ত্বাবধানে আছে আপনার ছেলে। সুতরাং, সে যাতে ভাল হয়, সুস্থ থেকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা

পাশ করতে পারে সেদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি সব সময় রয়েছে আপনি জানবেন।'

মিসেস চ্যাটার্জি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। তাঁর এক একটা চিঠি পেয়ে বুঝতে পারতাম। অসিত নিয়মিতভাবে বছরের পরীক্ষা-গুলো পাশ করে যেতে লাগল। একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম আমি। মিসেস চ্যাটার্জিকে সে কথাও লিখেছি। কিন্তু আজ? একটা বড় স্টেশনে ট্রেন থামতে শোয়া থেকে উঠে বসলাম। মাথাটা ধরেছিল। ভেণ্ডারকে ডেকে চা-এর কথা বললাম।

দুটো ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাঝখানে টাঙ্গাটা দাঁড়াল। আমি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতে মিসেস চ্যাটার্জি তাঁর বাড়ির গেট-এর বাঁধানো উঁচু জায়গা ছেড়ে নিচে ঘাসের ওপর পা রাখলেন।

আমরা হাত তুলে পরস্পরকে অভিবাদন করলাম। মিসেস চ্যাটার্জির পিছনে গেট-এর গা ঘেঁসে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। তখন শরতের বিকেল। শান্ত পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ থেকে রোদের ছটা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। মিসেস চ্যাটার্জির পিছনে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখেও শান্ত আকাশের বিষণ্ণ পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠেছে লক্ষ্য করলাম।

গেট্ পার হয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সবুজ একটুকরো মাঠ দু তিনটে শালিকের কিচিরমিচিরে ভরে উঠেছে। আমাদের পায়ের শব্দে পাখিরা উড়ে দূরে সরে গেল। আমরা কোন কথা না বলে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠলাম।

একটা ছোট চৌকোণ টেবিলের একদিকে একটা কাঠের চেয়ার, অন্যদিকে পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ার দাঁড় করানো রয়েছে। টেবিলের ওপর সবুজ রঙের একটা ঢাকনা বিছানো। বিকেলের মৃদু মন্দ হাওয়ায় ঢাকনার ধারগুলো অল্প অল্প কাঁপছিল।

'বসুন ডাক্তারবাবু।' মিসেস চ্যাটার্জি আমাকে প্রথম থেকে ডাক্তারবাবু ডেকে এসেছেন। আমার হাত থেকে সুটকেস তুলে নিয়ে তিনি দরজার পাশে সরিয়ে রাখলেন।

আমি বসলাম। মিসেস চ্যাটার্জি উল্টোদিকের বেতের চেয়ারে বসলেন। 'তুমি চা-এর ব্যবস্থা কর বৌমা।' মিসেস চ্যাটার্জি মেয়েটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পরে আমার দিকে চোখ সোজা করে ধরলেন। 'অসিতের বৌ,—আপনি তো ওকে দেখেননি।'

আমি ঘাড় হেঁট করে মাথা নাড়লাম।

মেয়েটি একদিকের একটা দরজার পর্দার ওপারে চলে গেল। আমি ঘাড় তুলে মিসেস চ্যাটার্জির দিকে তাকালাম।

'আপনার শরীর ভাল আছে?'

'হ্যাঁ আছে, মাথাটা মাঝে মাঝে ধরে।' মিসেস চ্যাটার্জির স্বর ক্লান্ত কিন্তু আন্তরিকতায় বড় বেশি স্নিগ্ধ। আমার খুব ভাল লাগল। বললাম, 'রোজই মাথা ধরে?'

'না, কোনো কোনো দিন।'

'ও কিছু না, সকালে বিকেলে একটু একটু বেড়াবেন।' চুপ করলাম। মিসেস চ্যাটার্জি চুপ। শালিকগুলো আবার মাঠে নেমে কিচিরমিচির শুরু করেছে। কতক্ষণ কাটল। মিসেস চ্যাটার্জির কানের পাশে দুটো চুল শাদা হয়ে এসেছে আমার চোখে পড়ল। একবার দেখে আমি অন্যদিকে চোখ ফেরালাম। মিসেস চ্যাটার্জির ভারি নিঃশ্বাস পতনের শব্দ আমার কানে এল, কিন্তু তাঁর দিকে তাকাইনি।

একটা ট্রে হাতে নিয়ে অসিতের স্ত্রী ফিরে এল। টেবিলের ওপর চা এবং কিছু খাবার রেখে মেয়েটি আবার ভিতরে চলে গেল। মিসেস চ্যাটার্জি আমার দিকে চায়ের পেয়ালা ও খাবার শুদ্ধ প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে নিজের জন্য একটা চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন।

'চা খান।'

কথা না বলে আমি চামচ দিয়ে একটু পুডিং ভেঙে মুখে তুলি। আস্তে আস্তে মুখ নাড়ি। মাঠের পাখিগুলো দেখি। যখন ঘাড় ফিরিয়ে চায়ের পেয়ালার জন্য হাত বাড়াই হঠাৎ চোখে পড়ে মিসেস চ্যাটার্জির চোখের কোণায় একটা বড় জলের ফোঁটা দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে আমি পেয়ালায় চুমুক দিই।

আর একবার এসেছে অসিতের স্ত্রী। আমি কবির মত বর্ণনা করতে পারব না। কিন্তু তা হলেও একটু বলতে পারি মেয়েটিকে দেখে মনে হয় একটা:জমাট দীর্ঘশ্বাস! দুদিন ছিলাম মাত্র। শেষ দিন ওদের ছেড়ে আসার শেষ মুহূর্তেও আমার তাই মনে হয়েছিল। ছোটখাট শরীর। মিসেস চ্যাটার্জি কি অসিতের মতন খুব একটা তীব্র ফরসা রঙ না গায়ের। মাজাঘসা নরম সুরের রঙ। ওর বিষণ্ণ নির্মল চোখ দুটির সঙ্গে এরকম রঙ না হলে মানাতনা, আমি চিন্তা করছিলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি চোখ মুছলেন।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে আমি মুখ মুছলাম।

'আপনি রাত্রে ভাত খান ডাক্তারবাবু?' অসিতের স্ত্রী প্রশ্ন করছিল। আমি হেসে ঘাড় কাত করলাম। 'গরম ডাল ভাত আমি পছন্দ করি মা। বুড়ো বয়সে অনেকে রাত্রে রুটি খায়, আমি খাই না।' কথার শেষে অল্প হাসলাম। বিশীর্ণ হেসে মেয়েটি আবার পর্দার আড়ালে সরে গেল।

বুঝলাম রান্নার উদ্যোগ আয়োজন চলেছে।

আবহাওয়া, বাজার দর, কলকাতা ও মধুপুরের সমাজ-জীবনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক সমালোচনা করে আমি ও মিসেস চ্যাটার্জি আরো কিছুটা সময় কাটালাম। তারপর উঠে আমি বারান্দায়— বারান্দা থেকে ঘাসের জমিতে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে একলা একটু

সময় পায়চারী করলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। মধুপুরের নির্জন জীবন একটানা ঝিঁঝির ডাকে ভরে গেছে। আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে ফিরে চললাম।

মাঝের হলঘরে একটা হেজাক্ জ্বলছিল। প্রখর আলোর সামনে বসে মিসেস চ্যাটার্জি আর তাঁর পুত্রবধূ। যেন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন দুজন। আমি ভিতরে ঢুকতে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

'অনেকটা হাঁটলেন?'

অল্প হেসে মিসেস চ্যাটার্জির দিকে তাকাতে গিয়ে আমি বিমর্ষ হয়ে গেলাম। সংক্ষেপে বললাম, 'হ্যাঁ, ওই একটু রাস্তা।'

মিসেস চ্যাটার্জি আর কিছু বললেন না। অসিতের স্ত্রী বলল, 'বসুন।'

একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

আমার কথার অপেক্ষা না রেখে মিসেস চ্যাটার্জি ও অসিতের স্ত্রী উল্টোদিকের দুটো চেয়ারে বসলেন। এখন কি কথা হবে আমি বেশ আঁচ করতে পারছিলাম। এতক্ষণ শুধু লৌকিক শিষ্টাচারের পালা গেছে। এতক্ষণ আকাশের রঙ ছিল, পাখির ডাক ছিল, মাঠের সবুজ গাছপালার মর্মর ছিল। যদি শোকাতুরা মা কি স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস শুনে বা চোখের জল দেখে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম, ক্লান্তি বোধ করতাম, তবে বাইরে চোখ রেখে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমি স্বাভাবিক হতে পারতাম, হাল্কা নিশ্বাস ফেলতে পারতাম। মিসেস চ্যাটার্জির চিঠি মনে পড়ল। কিন্তু এখন? বাইরে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। আর এখানে চার দেয়ালের ভিতর বন্দী হয়ে দুই জোড়া কাতর ছলছল চোখের ছবি সামনে নিয়ে আমি বসে আছি। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা সম্ভব? কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি বলা যায়, কি বললে এই বুকচাপা দুঃসহ পরিবেশ হাল্কা হবে

মূঢ়ের মতন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমি আঁতকে উঠলাম। বিপরীত দিকের দেয়ালে টাঙানো অসিতের ব্রমাইড ছবিটার ওপর চোখ পড়তে আমি তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলাম। যেন মিসেস চ্যাটার্জি আমার চেহারার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। মিসেস চ্যাটার্জির পাশে বসা রৌদ্রদগ্ধ ফুলের মত ক্লান্ত স্তিমিত আর একজোড়া চোখ আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করল। তাঁরা ভুল বুঝলেন। তাঁরা তো ভুল বুঝবেনই। মনে মনে বললাম, তাঁদের পুত্র তাঁদের স্বামীকে তাঁরা ভুল বুঝে এসেছেন। ব্রমাইড ছবির মুখ দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি ঘৃণায় না—বেদনায়। প্রিয় তরুণ ছাত্রের স্মৃতি বৃদ্ধ শিক্ষককে নতুন করে শোকাতুর করে তুলেছে এ-ছাড়া তাঁরা আর কি ভাবতে পারত?—একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তাঁরা দুজনেই তখন চোখে আঁচল চাপা দিয়েছেন টের পাই। আমি উঠে বারান্দায় গেলাম। ব্রমাইড ফটোর একজোড়া চোখ আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল। নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চোখ তুলি। যেন দুরপনেয় এক কলঙ্কময় স্মৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমি রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় খুঁজি। আমার মনে হল যদি অসিতের স্বভাবের, তার চরিত্রের গোপন বিকৃতির কথা এঁদের কাছে সময় মত তুলে ধরতে পারতাম, আজ নিজের কাছে নিজেকে এতটা অপরাধী মনে হত না। কিন্তু পারিনি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছিল পারব, অসিতকে সংশোধন করতে পারব। যেমন নির্মল ফুলের মতো ছেলেটিকে মিঃ চ্যাটার্জি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ঠিক তেমনটি করে আবার আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব মিসেস চ্যাটার্জির কাছে, তার নব পরিণীতা বধূর কাছে। হায়রে আশা! চোখের কোণায় জল দাঁড়ায় টের পাই। রুমাল দিয়ে মুছি। পায়ের শব্দে চমকে উঠলাম। মিসেস চ্যাটার্জি এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন।

'ন'টা বেজে গেল।'

'হ্যাঁ।' আমি আমার হাতঘড়ি দেখে গাঢ় গলায় বললাম, 'একটু রাত হতে না হতে এসব জায়গা কত চুপ হয়ে যায়।'

'আজকাল খুব বেশি চেঞ্জার মধুপুরে আসে না।' ধরা গলায় মিসেস চ্যাটার্জি বললেন। মিসেস চ্যাটার্জির কথা শেষ হতে পিছন থেকে ক্ষীণ পরিচ্ছন্ন গলায় অসিতের স্ত্রী বলল, 'আমাদের রান্না হয়ে গেছে। আপনি কি এখন খাবেন?'

'হ্যাঁ মা।' আমি সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াই। ছায়ার মতো অস্পষ্ট দুটি মূর্তি বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। যেন আমার মতো তাঁরাও রাত্রির আকাশে সান্ত্বনা খুঁজতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইউক্যালিপটাস গাছের মৃদু গন্ধ মেশানো অল্প অল্প বাতাস বইছিল। অন্ধকারে টের পাই দুজনে আঁচল দিয়ে আবার চোখ মুছছেন।

'চলুন ভিতরে।' আমি গলার স্বর স্বাভাবিক করে ফেললাম। তাঁরা কথা না বলে আমাকে অনুসরণ করলেন।

খেতে বসে লক্ষ্য করলাম ফটোর ফ্রেমে টাটকা যূঁই ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধূপকাঠি জ্বলছে নীচে। জায়া ও জননীর মুখের দিকে স্নেহমাখা চোখে প্রেমাতুর চোখে তাকিয়ে আছে অসিত।

'শেষ সময় একবার চোখে দেখলাম না।' মিসেস চ্যাটার্জি কি অভিযোগ করছেন? আমি চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম।

মিসেস চ্যাটার্জি নিজেকে সংশোধন করলেন।

'আমার মনে সান্ত্বনা ছিল কাছে ডাক্তারবাবু আছেন। আমার অসিতের সবচেয়ে বড় বন্ধু, সবচেয়ে বড় আত্মীয়।'

অল্প হাসলাম।

'আমার ইচ্ছা ছিল একটা টেলিগ্রাম করে দিই। কিন্তু, কিন্তু লাস্ট মিনিট পর্যন্ত আমি আশা ছাড়তে পারিনি।'

'তাই হয়।' মিসেস চ্যাটার্জি না—তাঁর পুত্রবধূ কথা বলল। যেন নিয়তির নিষ্ঠুর হাসি ঠোঁটে বুলিয়ে মেয়েটি একদিকের দেয়ালে চোখ রেখে বলল, 'যে যাবার সে শেষ মুহূর্তেও আশার দীপ জ্বালিয়ে রেখে চলে যায়। তাই হয়।'

মিসেস চ্যাটার্জি একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন।

যেন তা আমার কানে আসেনি এমন ভান করে দুধের বাটি টেনে নিয়ে বললাম, 'অসুখ সাধারণ—অসুখটা তো কিছু না—ওই—' থামলাম।

'হার্টফেল করেছিল।' মিসেস চ্যাটার্জি আমার হয়ে কথা শেষ করলেন।

বললাম, 'কদিন থেকে শরীরটা খারাপ দেখছিলাম, বললাম, একবার মধুপুর ঘুরে এসো। কিছুতেই শুনবে না। সামনে ফাইন্যাল। এখন ওখানে যাওয়া মানে আমার আর একটা বছর লস্ করা। কিছুতেই শুনল না।'

মিসেস চ্যাটার্জি অধোবদন। মেয়েটি একদৃষ্টে ফটোর দিকে চেয়ে। চোখের পলক পড়ছে না। স্ফীত নাসারন্ধ্র। অধরোষ্ঠ কাঁপছে। এক ফোঁটা জল টপ্ করে ওর কোলের ওপর ঝরে পড়ল। হেজাকের তীব্র আলোয় আমার চোখে কিছুই এড়াল না। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। কোনমতে খাওয়া শেষ করলাম।

আর সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার মনে হচ্ছিল, উচিত হয়নি, এরকম হতে দেওয়া ঠিক না। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল—কেন নয়। এই ভাল। কী অধিকার আছে আমার অসিতের বিকৃত নিষ্ঠুর কুৎসিত চেহারাটা তাঁদের চোখের সামনে তাঁদের মনের সামনে মেলে ধরার। স্নেহের স্মৃতি প্রেমের স্মৃতি নিয়ে যদি তারা বেঁচে থাকতে চায় থাকুক—অসিতের গলায় দুবেলা ফুলের মালা পড়ুক, ধূপের ধোঁয়ায় তার স্মৃতি আরো পবিত্র আরো স্নিগ্ধ হয়ে উঠুক। অসিত কাদের সঙ্গে মিলে মদ ধরতে শিখেছে। কোনো

রাত্রে হস্টেলে ফিরছে কোনো রাত্রে ফিরছে না। চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিপোর্ট করছেন অসিতের খারাপ অসুখ করেছে। আমি ডেকে অসিতকে সাবধান হতে বলি। 'কিছুই হয়নি আমার কাকাবাবু—আমার নামে অনেক মিথ্যা রিপোর্ট আপনার কানে আসছে বুঝতে পারি'—গম্ভীর হয়ে বলি, 'বেশ এসব কথা যেন মিথ্যাই হয়—তুমি ভাল ছেলে হয়ে সোনার ছেলে হয়ে তোমার মার মুখ, আমার মুখ উজ্জ্বল করবে আমি এটাই তোমার কাছ থেকে আশা করি। মানুষ ভুল করে। আবার নিজেকে সে সংশোধনও করে। ভুলভ্রান্তি তো জীবনে ঘটবেই। আমি রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই যেন পরলোকগত মিঃ চ্যাটার্জির ইচ্ছা, তোমার মার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করে তুমি আমাদের সান্ত্বনা দাও।' উপদেশ শুনে অসিত আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর কিছুদিন সত্যি তার সম্পর্কে কোনোরকম অভিযোগ আমার কানে আসেনি। মনে শান্তি পেলাম। আমার একদিনের উপদেশে কাজ হয়েছে। আবার আত্মপ্রসাদ অনুভব বরতে লাগলাম। কিন্তু আমি কি জানতাম আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে তার সর্বনাশের গোপন পথে সমান বেগে এগিয়ে চলেছে। অসিতের বিয়ের আগের বছর এসব কথাবার্তা উঠেছিল। তারপর মিসেস চ্যাটার্জি একদিন আমার কাছে ছেলের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। ভাল মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। যদি আমি রাজী থাকি,—আমার রাজী না থাকার কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া ভাবলাম যদি সত্যি সঙ্গদোষে পড়ে ছেলেটা একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়ে থাকে বিয়ের পর শুধরে যাবে। বয়সটা খারাপ। এই বয়সের ছেলেদের বিয়েটা ওষুধের মত কাজ করে। চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ আমি মিসেস চ্যাটার্জিকে সম্মতি দিলাম। কিন্তু তারপর কী হল? এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বিয়ে করে সেই যে অসিত মধুপুর থেকে ফিরে এল আর গেল না। আমি নিজের চোখে

দেখেছি অসিতের নবপরিণীতা স্ত্রী সুন্দর সবুজ খামে করে অসিতের হস্টেলের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে। সেসব চিঠির উত্তর অসিত দিত কিনা জিজ্ঞেস করিনি। মনে হয় দেয়নি। মনে হয় যদি বা সে চিঠি লিখেছে, এগজামিন, পড়ার চাপ, হাসপাতালের ডিউটি ইত্যাদির নাম করে একদিনের জন্যেও কলকাতা ছাড়া সম্ভব নয় বলে মেয়েটিকে, মাকে বুঝিয়েছে। মিসেস চ্যাটার্জি তাই বুঝেছেন, অসিতের স্ত্রী তাই বুঝেছিল। সেই ধারণা আজও দুজনের মনে অটুট হয়ে আছে। আর ওদিকে আমি কি দেখতাম? যেন বিয়েটা একটা মন্দ প্রতিক্রিয়ার মতো অসিতের স্বভাবের ওপর কাজ করতে লাগল। হ্যাঁ, তারপর আর কিছু গোপন ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল মাতাল অসিত। আমি তাকে হস্টেল থেকে বার করে দিয়েছি। শুনেছিলাম উল্টোডাঙ্গার একটা বস্তীতে একটা খারাপ মেয়ের আশ্রয়ে সে দিন কাটাচ্ছে। উঃ—আমি লোক পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে তাকে খবর দিয়েছি যেন সে মধুপুর চলে যায়। শাসিয়ে বলেছি তার মার কাছে, তার স্ত্রীর কাছে চিঠি দেব। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তার ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই। স্কাউণ্ড্রেল আমাকে চিঠি দিয়ে জানায়। যেখানে সে আছে সেটাই তার আসল সংসার, যাকে নিয়ে আছে সে-ই তার জীবনসঙ্গিনী। সুতরাং—

আমি অনেকদিন আর খোঁজ রাখিনি তার। একদিন একটা ছেলে এসে খবর দিল অসিতের অবস্থা খারাপ। বোধহয় বাঁচবে না। না গিয়ে পারলাম না। উল্টোডাঙ্গার বস্তীর ঘরে শুয়ে আছে, একটা বয়স্ক মেয়েকেও দেখলাম সেখানে। পরীক্ষা করে দেখলাম অসিতের লিভার পচে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে এলাম। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিল। আর সেই অবস্থায় ও শেষ নিশ্বাস ফেলল। আমি মুক্তির নিশ্বাস ফেললাম। কি—অসিতের শেষ কদিনের অধঃপতনের গতি এত দ্রুত অনিবার্য হয়ে উঠছিল যে আমি

সব দেখে শুনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। তখন অবশ্য সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আগে তা হয় নি। ও ফিরবে, ও ভাল হবে চিন্তা করে একদিনও ছেলের মতিগতি সম্পর্কে তার মাকে আমি চিঠি দিয়ে জানাইনি। যেন মিসেস চ্যাটার্জিকে এসব জানান মানে আমার পরাজয়, আমার ব্যর্থতা স্বীকার করা। হায়রে মানুষের দম্ভ। আজ সেই মিথ্যা দম্ভের শাস্তিভোগ করতে হচ্ছে আমাকে। মিথ্যা, মিথ্যা। অসিত সত্য ছিল। মিথ্যা আবরণে গা ঢাকা দিয়ে কেবল শেষদিন হাসপাতাল থেকে আমি মিসেস চ্যাটার্জিকে টেলিগ্রাম করেছিলামঃ 'অসিত আমাদের সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেল।' আর কিছু বলা হল না। আর কিছু বলতে পারিনি।

তারপর এই দীর্ঘ একবছর, মানুষ যেমন গোপন ক্ষত পুষে রাখে আমি বুকের মধ্যে ক্ষত পুষে রেখেছি। এক একবার ইচ্ছা হয়েছে সব মিসেস চ্যাটার্জিকে খুলে বলে দিই। আমার ভীরু অবস্থার মনের মিথ্যাচারিতা দিয়ে তাঁদের, বিশেষ করে অসিতের স্ত্রীকে আমি ঠকাচ্ছি। এটা কি উচিত? রাত্রে ভাল ঘুম হল না।

সকালে বারান্দায় বসে ইউক্যালিপটাসের শাদা পাতায় রোদের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে চা খেলাম।

ইচ্ছা হচ্ছিল তখনই মিসেস চ্যাটার্জিকে বলি দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় ফিরছি, কিন্তু পারলাম না।

দুদিন থাকবার কথা; তার আগেই হঠাৎ আমার বিদায় নেওয়ার প্রস্তাব শুনে তিনি ব্যথা পাবেন। মিসেস চ্যাটার্জির কাতর চোখ দেখে প্রস্তাবটা চেপে গেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আর একজোড়া কোমল চোখ আমাকে দেখছে। বুঝতে পারলাম কেন বার বার আমাকে দেখা। আমি জীবন নদী। অনেককাল বয়ে

চলেছি। অনেক স্মৃতির ঝিনুক আমার তটে জমা হয়েছে। দুটি অসহায় নারী আমার তটে বসে স্মৃতির ঝিনুক কুড়াতে চাইছে। তুমি অসিতের কথা বল। কলকাতায় সে কেমন ঘরে থাকত, কি খেত, কতটা সময় পড়াশোনা করত, কাদের সঙ্গে খেলাধূলা করত? খুব সকালে ওর ঘুম ভাঙত না বেলা করে? রাত কটায় ও শুয়ে পড়েছে? এত বড় অসুখটা হবার আগে ছোটখাটো কিছু অসুখ করেছিল কি ওর? যেন ওরা প্রশ্ন করছিল। দুজনের চোখের ভাষা দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম আর আত্মার মধ্যে দুঃসহ জ্বালা অনুভব করছিলাম।

একটা রঙীন প্রজাপতি বাইরে মাঠের ঘাসের ওপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। যেন গভীর মনযোগ দিয়ে আমি মনোহর পতঙ্গ দেখছি ভান করে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'আপনি কি হরিণের মাংস খান?' পিছন থেকে অসিতের স্ত্রী প্রশ্ন করছিল।

ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললাম, 'আমি সব খাই মা—খাওয়ার মধ্যে আমার বাছবিচার নেই।'

অসিতের স্ত্রী পর্দার ওপারে চলে গেল। বুঝলাম দুপুরের রান্নার উদ্যোগ আয়োজন এখনই আরম্ভ হবে।

মিসেস চ্যাটার্জি একবার আড়চোখে পর্দাটা দেখে পরে আমার চোখে চোখ রাখলেন।

'মনতোষ মাংস পাঠিয়েছে। হরিণ শিকার করে এনেছে কোন্ পাহাড় থেকে।'

'কে মনতোষ?' হঠাৎ প্রশ্ন করলাম।

'এখানকারই ছেলে। এবার বি-এসসি পাশ করেছে। বড় ভাল ছেলে, সুন্দর ছেলে।' মিসেস চ্যাটার্জি তাঁর শাদা শীর্ণ একটা আঙুল তুলে বাইরের দিকে দেখালেন। 'ওই তো হলদে দোতলা

বাড়ি হিমংশুবাবুর, সারা জীবন জজীয়তি করে এখন মধুপুরে বাড়ি করে থাকছেন।'

'জজ সাহেবের ছেলে মাংস পাঠিয়েছে?' অল্প হাসলাম আমি। মিসেস চ্যাটার্জি না হেসে ঘাড় কাত করলেন। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম সৌজন্যের ক্ষীণ হাসিও আমার পক্ষে তখন উচিত হয়নি। মিসেস চ্যাটার্জির চোখ ছল ছল করে উঠল।

'একটি ছেলে বড় হলে কত ভাল লাগে দেখতে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অসিত বড় হতে হতে থেমে গেল, জীবনদীপ নিভে গেল। কিন্তু,—ভাল হওয়ার দুরাশার কথা চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে চোখ ফেরালাম।

'মনতোষ মাঝে মাঝে আসে এ-বাড়ি। এসে আমার কাছে বসে। বড় শান্তি পাই।'

মনতোষ নামক এক যুবকের মধ্যে অসিতের প্রতিবিম্ব? কেমন অস্বস্তিবোধ করছিলাম ছবিটা মনে করে। বললাম, 'আমি একটু ঘুরে আসি মিসেস চ্যাটার্জি।'

মিসেস চ্যাটার্জি ঘাড় কাত করলেন।

'মধুপুর কি আগে এসেছেন।'

'একবার এসেছিলাম। ভাল করে শহরটা দেখা হয়নি।'

'আচ্ছা।' এবার মিসেস চ্যাটার্জি ক্ষীণ হাসলেন। 'বেশি বেলা করবেন না। দশটার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে কিন্তু।'

'আমি বেলা করে খাই। তার জন্য ভাববেন না।' ছড়িটা হাতে ঘাসের ওপর নেমে পড়লাম।

শাল আর মহুয়ার জঙ্গল দেখতে দেখতে এববার মনে হল কি দরকার এই প্রবঞ্চনার, এই ছলনার। অসিত কোনদিনই মনতোষ হতে পারত না। মনতোষ এসে পাশে বসলে বুক শান্ত হয়, প্রাণ শীতল হয়। অসিত এসে পাশে বসলে ঘৃণায় আপনার আত্মা

কুঞ্চিত হয়ে উঠত। তার ঠোঁটের পাশে, তার নাকের পাশে দুষ্ট ব্যাধির কদর্য ছাপ সে লুকোতে পারেনি। আপনি সহ্য করতে পারতেন না মিসেস চ্যাটার্জি, তুমি সহ্য করতে পারতে না রেবা। শাশুড়ীর মতো রেবাও মনতোষকে দেখলে বুকে সান্ত্বনা পায় কিনা চিন্তা করতে করতে হাতের ছড়ির ডগা দিয়ে শুকনো শালপাতাটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শতছিদ্র করে ফেললাম। একটা দোয়েল পাশের মহুয়ার ডালে বসে শিস্ দিচ্ছিল।

বেশ কিছুটা পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চললাম। গেট পার হয়ে ভিতরে মাঠে পা বাড়াতে আমার চোখে পড়ল দিব্যকান্তি সুদর্শন যুবকটিকে। মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে বারান্দায় মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছে। রেবাকে দেখলাম না।

বারান্দায় উঠতে ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মিসেস চ্যাটার্জি পরিচয় করিয়ে দিলেন।

হিমাংশুবাবুর ছেলে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। আমি তার মাথায় হাত রেখে শুভেচ্ছা জানালাম। মধুপুরের জল হাওয়া, কলকাতার আবহাওয়া, মধুপুরের মাছ দুধ আনাজ, কলকাতার মাছ দুধের দর ও দুষ্প্রাপ্যতার তুলনামূলক সমালোচনা শেষ করে আমরা দেশের বিদেশের কিছু কিছু খুচরো রাজনীতির খবর আলোচনা করলাম। তারপর মনতোষকে প্রশ্ন করে জানালাম এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে খুব শিগগির সে বিলেত যাচ্ছে। বাবা রাজী হয়েছেন। মা রাজী হচ্চেন না। খুব সম্ভব রাজী হয়ে যাবেন।

'মায়ের ইচ্ছা ছেলে বিয়ে করে একটি বৌ তাঁকে উপহার দিয়ে তবে বিদেশ পড়তে যাক।' মিসেস চ্যাটার্জি আবার সেই ক্ষীণ ক্লান্ত গলায় হাসলেন।

সৌজন্যের খাতিরে আমি অল্প হাসলাম।

মনতোষ লজ্জায় মুখ নামালো।

আর একটু সময় এ-বাড়ি থেকে আমার ও মিসেস চ্যাটার্জির

সঙ্গে কথা বলে আস্তে আস্তে উঠে ছেলেটি চলে গেল। মনতোষ নামক যুবকটি চলে যাওয়ার ঠিক দু মিনিট পর হঠাৎ করুণ কান্নার শব্দে আমি চমকে উঠলাম। এ-বাড়ি এসে আমি দীর্ঘশ্বাস শুনেছি, চোখের জল দেখেছি, একটু আগেও মিসেস চ্যাটার্জির গাল বেয়ে জলের ধারা নামতে আরম্ভ করেছিল (মনতোষ আসাতে বন্ধ হয়ে যায়), কিন্তু কান্নাকে ভাষা দিতে, সুর দিতে এই প্রথম শুনলাম। এই প্রথম বুঝলাম নীরব কান্না আর সুর করে কান্নার মধ্যে কেন আকাশ পাতাল তফাৎ। রেবার ছলছল চোখের ভাষা আমাকে অস্থির করেছে, উন্মনা করেছে, উদাসীন করেছে। দেয়াল থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাইরে গাছের পাতা দেখেছি, আকাশের রঙ, মেঘের আনাগোনা দেখতে দেখতে হৃদয়ে সান্ত্বনা খুঁজেছি। আর এখন?

আমার মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত স্নায়ু যেন ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে শীতলতা কথাটা আসে। কিন্তু মৃত্যুর শোক —বিরহের কান্না যে কত ভয়ঙ্কর শীতল হৃদয়ভেদী হতে পারে রেবার কান্না শুনে তা উপলব্ধি করতে পারলাম। যেন আমার শরীরের প্রত্যেকটা রক্তকণা জমে বরফে পরিণত হচ্ছিল। এই কান্নার কাছে কোনো সান্ত্বনা নেই, কোনো কিছু আশ্রয় করে মনকে উদাসীন হতে দেবার অবকাশ এর মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। রেবার কান্না আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমাকে বোবা, অথর্ব, বলা যায় অচৈতন্য করে দিল। যেন আমার চারপাশে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ তখন অফুরন্ত রোদ, পাখির গান, গাছের পাতার সরসর শব্দ, প্রজাপতির নৃত্য নিয়ে পৃথিবী পূর্ণ উদ্যমে সূর্য প্রদক্ষিণে মেতে ছিল। কিন্তু এ বাড়ির বারান্দার বসে কে তা বিশ্বাস করবে।

টের পেলাম মিসেস চ্যাটার্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। টের পেলাম তিনি পাশের ঘরে গেছেন। কান পেতে রইলাম। যেন কান্নার একটানা সুরে ছেদ পড়ল। কিছু বলছেন কি তিনি

শোকাতুরা পুত্রবধূকে? কথাগুলো বুঝতে পারলাম না। কান্নাটা থামল বলে স্বস্তিবোধ করছিলাম।

একটু পরে মিসেস চ্যাটার্জি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসলেন। তিনিই প্রথম কথা বললেন।

'এমন রাতদিন অবুঝের মত কাঁদাকাটা করলে শরীর টেঁকে! আমি বুঝিয়ে হয়রান হয়ে গেছি। যে চলে গেল, যে রইল না, কাঁদলে সে আর ফিরবে?'

চমকে মিসেস চাটার্জির মুখ দেখি। কথা বলতে পারি না। তবে এটুকু লক্ষ্য করে শান্তি পেলাম, ছেলের জন্য তিনিও শোক করেন, কিন্তু, ভেঙে পড়তে তিনি নারাজ। 'যে চলে গেল হাজার কাঁদলেও সে ফিরবে না।' যেন আমার বুকের ক্ষতের ওপর মলমের প্রলেপের মতো কথাটা কাজ করল। জ্বালা কমল।

'তাই', ঘাড় নেড়ে বললাম, 'একমাত্র আপনিই ওকে—মানে অসিতের বৌকে সান্ত্বনা দিতে পারেন। আপনি ছাড়া কে আর ওর এত কাছে আছে।'

মিসেস চ্যাটার্জি আর কথা বলেন না।

আমার ক্ষতটা আবার জ্বালা করছিল। আমিও পারি আমিই তো একমাত্র দুর্মুখ যে অসিতের মৃত্যুর সংবাদ পাঠিয়ে যুঁই ফুলের মতো কোমল একটি হৃদয়কে থেঁতলে পিষে চিরকালের মতো নষ্ট করে দিলাম। আবার আমিই পারি এই যুঁইফুলের সামনে পৃথিবীর রঙ গান গতি ও স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনতে। আমি জানি, আমি জানতাম বেশ্যাসক্ত লম্পট অসিত বিয়ের পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একবারও তোমার কথা ভাবেনি, তোমাকে চায়নি, শুনলে, রেবার কান্না থেমে যাবে। একদিন শুধু একবার তপ্ত মরুর জ্বালা নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক ঠেলে উঠবে। তারপর? তারপর সে শাল মহুয়ার বনের ধারে দাঁড়িয়ে হারানো পাখির গান শুনতে আবার কান পেতে ধরবে। যৌবনের ধর্ম মানুষ সব অবস্থায়

অস্বীকার করতে পারে কি! রেবা পারবে না। এখন পারছে। কিন্তু—

আমার সেই সাহস কোথায়? চুপ করে রইলাম আর বুকের ক্ষতের জ্বালা শরীর দিয়ে সহ্য করতে লাগলাম। সত্যি আমি কাপুরুষ। রেবার মিথ্যে স্মৃতিকে সীসার মতো বিবর্ণ ব্যর্থ করে দিতে মনে মনে বল পাচ্ছিলাম না।

সেদিনই বিকেলে কলকাতার গাড়ি চাপলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি একটু অবাক হলেন, দুঃখ করলেন। জরুরী কেস-এর কথা বলে তাঁকে ভুলিয়ে দিলাম। বিকেলে মনতোষের সঙ্গে বারান্দায় বয়ে তিনি চা খাচ্ছিলেন। আমার টাঙ্গার কাছে এসে তিনি অনুনয়ের সুরে বললেন, 'এখানে তো পারলেন না। কলকাতায় গিয়ে আপনি ওকে বুঝিয়ে একটা চিঠি দেবেন। আমি পাষাণ হয়ে গেছি। আমার কথা ভাববেন না। পোড়া ইঁট ঝড় জলে ক্ষয় হবে না। কিন্তু রেবা যে বড় বেশি নরম। এরকম রাতদিন কাঁদাকাটা করলে ও বাঁচবে না।'

'আমি চেষ্টা করব।' ক্লান্ত হেসে মিসেস চ্যাটার্জিকে শেষ সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

কলকাতায় ফিরেছি। দুদিন পরের ঘটনা। দুপুরে হাসপাতালের ডিউটি সেরে লাঞ্চ খেতে বাসায় ফিরেছি। দেখি দরজার সামনে রিক্সা দাঁড়িয়ে। কেউ এসেছে বুঝি। অসময়ে রুগী এসে বাসায় চড়াও হয়েছে ভেবে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকে আমার চক্ষু স্থির। মিসেস চ্যাটার্জির পুত্রবধূ রেবা। ক্লান্ত মলিন চেহারা। খুব সাধারণ বেশভূষা। যেন অস্থির হয়ে ও মধুপুর থেকে চলে এসেছে। আমার বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। আমি ভিতরে ঢোকামাত্র ও পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

'কি ব্যাপার, হঠাৎ, বৌমা ?'

'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে।'

ব্যস্ত হয়ে ওকে বসতে বললাম।

'তুমি হাত মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ হও। খাওয়া-দাওয়া কর। বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

কথা শুনে রেবা বলল, 'পরে হবে—আগে কথাটা সেরে নিই।'

অগত্যা আমিও একটা চেয়ার টেনে বসলাম। তারপর নিচু গলায় ক্লান্ত মেয়েটি যা বলার বলল। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে প্রশ্ন করলাম, 'মনতোষ রাজী আছে ?'

রেবা ঘাড় কাত করল।

'ছেলের বাবা—মানে হিমাংশুবাবু ?'

রেবা ঘাড় কাত করল।

'মা ? মনতোষের মা ?'

'মার ইচ্ছা অনিচ্ছার জন্য বিয়ে আটকাবে না, আমার শাশুড়ী বলেছেন।' বলা শেষ করে রেবা কাঁদতে লাগল। এতক্ষণ পর আমার চোখে পড়ল অসিতের সেই ফটোটা আমার টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। রেবা ওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে বুঝলাম। ফটোর দিকে আমার চোখ পড়তে রেবা ওটা তুলে বুকের কাছে ধরে আরো জোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। একটু চিন্তা করে হঠাৎ যেন নিজের মনে বললাম, 'তা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিসেস চ্যাটার্জি এরকম চাইছেন কেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে—'

'টাকা ফুরিয়ে গেছে, সংসার চলছে না, বাড়ি মর্টগেজ করা আছে জজ সাহেবের কাছে। বিয়ের পর শাশুড়ী বাড়ি ফিরে পাবেন এবং অন্য সব দিক থেকে সুবিধা—' আর বলতে পারল না রেবা। কান্নার ধমকে ওর গলার স্বর আটকে গেল।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এখন কি করবে ঠিক করেছ ?'

'আমি লামডিং বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি।' আমার মুখের দিকে তাকালনা রেবা। জলভরা কালো চোখ দুটো ফটোর ওপর স্থিরভাবে ধরে রেখে ও অসিতকে দেখছিল।

আশ্চর্য, আমি তখনও চুপ করে রইলাম। অসিতের কদর্য চেহারা মেয়েটির সামনে তুলে ধরতে আমার ভয় করছিল। আমি কি কাপুরুষ? এবং সেই সঙ্গে ভাবছিলাম মিসেস চ্যাটার্জির কথা—অসিতের গর্ভধারিনীর কথা। ভাবছিলাম লোক-চরিত্র।

ভিজিট

দারুণ গ্রীষ্মে গায়ে একটা ভারি ছেঁড়া কোট। পরনের কাপড়টা হাঁটু অবধি এসে থেমে গেছে। মাথার এক তৃতীয়াংশ চুলে পাক ধরেছে। হাত চেপে ধরল : 'চিনতে পারেন ?'

এ অবস্থায় একটু অপ্রস্তুত হওয়া স্বাভাবিক। কোথায় যে দেখেছি, ঠিক মনে করতে পারি না, অথচ ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিব্যি হাসছে।

'ভুলে গেছেন—ভুলে গেছেন তো ? আশ্চর্য !'

বললাম, 'তাই তো, কবে যেন—'

'কেন, সেই টালি—টালিগঞ্জের ট্রাম—' বলতে বলতে লোকটির চোখ দুটো আস্তে আস্তে গোল হ'য়ে এল। 'বিড়ির আগুন লেগে আমার কাপড়-চোপড়—'

চট্ ক'রে দৃশ্যটা মনে পড়ে। বললাম, 'বিড়ির আগুনে আপনার কাপড় পুড়ে গেল।'

'হে—হে—' প্রবল উৎসাহে ভদ্রলোক এবার আমার হাত চেপে ধরলে। 'কাপড় কেন, আমি নিজেই তো পুড়ে গেছলুম, মশাই ! আপনি সেদিন না থাকলে রক্ষে ছিল নাকি—'

'নমস্কার।' এবার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করবার পালা, বললাম, 'ভালো আছেন—'

'আর ভালো'—কপাল কুঞ্চিত ক'রে ভদ্রলোক পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বার করলে, 'চলে ?'

'না, থাক।'

বিড়ি ধরিয়ে লোকটি হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যায়। তাকাল ইদিক-ওদিক। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'সেদিনের সেই ঘটনার পর ক'দিন আপনাকে খুঁজেছি, মশাই।'

একটু অবাক হই। 'আমায়—আমাকে খুঁজেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অত বড় শহর, চোখ থেকে একবার ফস্কে গেলে চেনা-মুখও কি আর সহজে চোখে পড়ে!' আঙুল দিয়ে ভদ্রলোক আমার পকেটটা দেখিয়ে দিলে, 'ওখানে যে যন্তর লুকিয়ে রেখেছেন, তা কি সহজে ভোলা যায়! না, ভুলতে পারি! অষ্টপহর ওটাই থেকে থেকে মনে পড়ছে।'

পকেটে স্টেথ্‌স্কোপ। বুঝলাম আমায় খুঁজে বেড়াবার সঙ্গত কারণ। 'ধরে রোগী আছে বুঝি?'

'ঘরে!' যেন কথাটা ব'লে অপরাধ করেছি, ভদ্রলোক রীতিমত ধমক দিয়ে উঠল। 'বলুন, ঘরে-বাইরে সর্বত্র। রোগী নিয়েই তো আজ আমি পথের ভিখিরি, মশাই—নইলে আমার—' কথা শেষ হ'ল না। এখান অবধি এসে ভদ্রলোক এমন প্রচণ্ড বেগে কাশতে আরম্ভ করল, যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব। কাশতে কাশতে বেঁকে ভেঙে পড়বার উপক্রম। একটু পর খানিকটা সুস্থ হয়ে, 'নইলে আমার কিছু চিন্তা ছিল নাকি!' ভদ্রলোক তখনো হাঁপাচ্ছে।

বললাম, 'এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসুন।'

'না, না—বসতে হবে না। ওটা হ'ল কিনা আমার আঠারো বছরের হাঁপানি, গা-সওয়া হয়ে গেছে।' হাসবার একটু ভঙ্গি ক'রে ভদ্রলোক ফের গম্ভীর হ'য়ে গেল। 'আর, এরই সূত্র ধ'রে অতুল আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করলে, মশাই!'

'অতুলটি কে?'

'বলব, সবই বলছি। ফ্রেণ্ডশিপ্‌ যখন হয়েছেই, আপনাকে না-বলাটা ঠিক হবে না।' ভদ্রলোক আমার হাত ধ'রে টানছে, 'এখানে নয়, জায়গাটা বড্ড পাব্লিক—চলুন, ওদিকে যাই।'

ট্রাম-স্ট্যাণ্ড পেছনে রেখে একটা গলির মুখে ভদ্রলোক আমায় টেনে নিয়ে গেল। 'আর, যদি কিছু মনে না করেন, খুব বেশি দূর

নয়—' গলির একদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমার মুখের দিকে ভদ্রলোক ভারি করুণ চোখে তাকাল। 'গরিবের ঘরে পায়ের ধুলো দেন তো—'

'পাগল হয়েছেন।' তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরি। 'এতে আবার পায়ের ধুলো-টুলো ওঠে নাকি! আমি যে বেড়াতেই বেরিয়েছি! চলুন।'

ভদ্রলোক মহাখুশি। 'সাধে বলেছে, আপনও পর পর হয়, আর পরও আপন হয়! না হ'লে আপনার সঙ্গে ক'দিনের আর পরিচয়! আর দেখুন—' আমার চোখের ওপর হাতের দশটা আঙুল প্রসারিত ক'রে, ভদ্রলোক আরম্ভ করল, 'দশ-আড়াই পঁচিশ—পঁচিশ বছর একসঙ্গে এক টেবিলে ব'সে অতুলটার সঙ্গে কাজ করলাম তো! শেষ পর্যন্ত ও কিনা আমার সঙ্গে এমন করলে!'

'আপনার কলিগ্ ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

শ্রাবণের মেঘের মত ভদ্রলোকের চেহারাটা থম্থম্ করে। বললে, 'তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে একদিন কথা কাটাকাটি—আর ও কিনা ওমনি সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করলে, নিবারণ রক্ষিতের যক্ষ্মা, শিগ্গির না তাড়ালে ও আপিসসুদ্ধু সবাইকে ডোবাবে। ব্যাস্, বিলিতি রক্ত টগ্বগিয়ে উঠল—নিকাল যাও। ফর্সা জবাব।'

'তাড়িয়ে দিলে!'

'তা আর কি! কত কাঁদাকাঁটি-সাধাসাধি। পর্যন্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট। ছোট সাহেব রসিকতা ক'রে টিপ্পনি কাটলে, হাঁপানি আর যক্ষ্মা টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ।'

গলিটা বাঁ-দিকে ঘুরে গেছে এবং সেদিকেই পা বাড়াই। ভদ্রলোক সংশোধন ক'রে দেয়, 'ডাইনে আসুন।'

প্রকাণ্ড দুই দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে সুড়ঙ্গের মত সংকীর্ণ পথ। একটা দেওয়ালের গায়ে আস্তর নেই। কোনোদিন হয়তো ছিল।

আজ সেখানে ছোটবড় নানা আকারের রাশি-রাশি ঘুঁটে পড়েছে। ভদ্রলোক তেমনি অনর্গল ব'কে চলেছে, 'আমার জন্যে নয়, ডাক্তারবাবু। হাঁপানির ব্যামো নিয়ে কি আর ব'সে আছি! ছুটোছুটি, হাম্‌লা-মাম্‌লা সবই করতে হয়। আসলে মেয়েটাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। টন্‌সিলের অসুখ। দু'দিন ভাল থাকে তো, ফের আরম্ভ হ'ল বেদনা-টাটানি; রাতে ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। হরিপদকে ডেকে দেখালুম। মরদ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বলে কিনা, আমার কোব্‌রেজি শাস্তরে এর ওষুধ নেই, ডাক্তার দেখাও। তা, রুই-কাতলা ডাকবার পয়সা কই, বলুন! বাবুরা গাড়ি হাঁকিয়ে চলেন, কথার আগে ষোলো টাকা ফি হাঁকেন। না, না, হাসবেন না—আপনার মত সোনার মানুষ তো সবাই নয়—'

ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসি সংবরণ করতে পারি নি। বললাম, 'সে তো ঠিকই! গরিবের অনেক অসুবিধে।'

'দাঁড়ান, এসে গেছি।'

একটা পুরোনো কাঠের দরজা। আস্তে ধাক্কা দিতে খুলে যায়। চৌকাঠ পার হ'য়ে সংকীর্ণ বারান্দা। মাঝখানে একসারি ইট বিছানো। হয়তো কাদা বাঁচাবার জন্যে।

না, বাইরে থেকে যতটা মনে হয়েছিল, ভেতরে ঢুকে ততটা খারাপ ঠেকল না। চুনকাম-করা, পর্দা-টাঙানো, বসবাসের যোগ্য দিব্যি পরিচ্ছন্ন ঘর। একদিকে একটা খাট বিছানো। দেওয়াল ঘেঁষে টেবিলটার চেহারা খুব সুন্দর না হ'লেও ভদ্রগোছের।

হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোক সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলে। পড়ন্ত বেলায় যেটুকু অন্ধকার জ'মে উঠেছিল দূর হ'ল। 'বসুন আপনি, পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।' পাশের দরজা দিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেল।

একলা ব'সে পাঁচ-সাত মিনিট কাটে। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। বাড়িটা অসম্ভব নির্জন। চেয়ারে ব'সে ঘাড় টান ক'রে সোজা হ'য়ে দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখি। একটা পোকা বাল্‌বের

চারদিকে অনর্গল ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ পাশে কপাট-নড়ার শব্দ হয়। ঘাড় ফেরাই। একটি মেয়ে।

ভেতরে ঢুকেই দুটি হাত একত্র ক'রে নমস্কার জানিয়ে মেয়েটি স'রে গেল টেবিলের ধারে। আয়নায় সেখানে মুখ দেখলে, কি খোঁপা ঠিক করলে, বোঝা গেল না। আঠারো উনিশ বছর বয়েস। পরনে একটা ফর্সা কাপড়, হাত-কাটা ব্লাউজ গায়ে, লক্ষ্য করলাম। এই সেই মেয়ে!

ফিরে এসে আস্তে আস্তে বললে, 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে?'

'না, অসুবিধে কি!' চেয়ারে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলাম। 'উনি কোথায়? বুড়ো ভদ্রলোক?'

'কে, বাবা! তাঁর ফিরতে দেরি হবে।'

মেয়েটি আবার স'রে যায় জানলার কাছে। কুঁচোনো পর্দাটা টেনে ঠিক ক'রে দেয়। গুন্‌গুনিয়ে একটা গানের সুর সাধছে বলেই মনে হ'ল। ভাবলাম, না, এ সে মেয়ে নয়। অসুস্থ মানুষ গান গায় না। ভারি অস্বস্তি বোধ করি; আর, অবাক হই ভেবে, এ বয়সে এ অবস্থায় একটি বাঙালী মেয়ের যতটা সংকুচিত, সুস্থির হবার কথা, তা যেন ওতে নেই। একা প্রায় ঘেমে উঠি। ভদ্রলোক হঠাৎ গেল কোথায়!

'বাবাকে খুঁজছিলেন! আপনার কিছু চাই বুঝি! সিগারেট খান?'

'না, সেকথা হচ্ছে না। ব্যস্ত হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। 'আমায় ডেকে আনলেন উনি, তাঁর মেয়ে না কার টন্‌সিলের অসুখ—'

'তাই বলুন।' ফিক্ ক'রে মেয়েটি হাসল। 'বুড়ো মানুষ অনেক-কিছু বলে। আপনি বুঝি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ।'

মেয়েটি হঠাৎ গম্ভীর। একদৃষ্টে আমার স্টেথ্স্কোপ্টার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলে। পরে পাশের সেই দরজার কাছে দিয়ে কপাট ফাঁক ক'রে উঁকি দিয়ে ফিরে এল। এসে ফিস্ফিসিয়ে বললে, 'দয়া ক'রে পাশের ঘরে আসবেন, ডাক্তারবাবু?'

'কেন, ও ঘরে কি?'

'আমার মা।'

'অসুস্থ নাকি?'

নিঃশব্দে ও ঘাড় নাড়ল।

হেঁয়ালি অনেকটা কাটে। হঠাৎ কেন জানি মনে হয়, মেয়ের অসুখের নাম ক'রে ভদ্রলোক আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে তার স্ত্রীকেও দেখাবে ব'লে। মুখ ফুটে বলতে পারে নি তখন, পাছে টাকাপয়সা বেশি দিতে হয়। আর, মেয়েটির টন্সিলের অসুখ নেই, তাই বা কে জানে! হয়তো মায়ের অসুখটা ওর কাছে বড়। নিজের কথাটা চেপে যাচ্ছে। একটু রাগ হয়, কষ্টও হয় ভদ্রলোকের কথা ভেবে। পালিয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল কি!

'কোথায় আপনার মা, চলুন।'

পাশের দরজা দিয়ে ও আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চৌকাঠের ওপারে অন্ধকার খুপ্রি। সেটা সিঁড়িকোঠা কি বারান্দা, বোঝা গেল না। ঠাণ্ডা পুরোনো একটা গন্ধ বারবার নাক দিয়ে অনুভব করলাম। আঁকাবাঁকা সরু পথ ধ'রে আরো খানিকটা অগ্রসর হবার পর মেয়েটি শেষে এমন একটা জায়গায় এসে আমাকে দাঁড় করালে, যেটাকে ঘর বা বারান্দা কিছুই বলা চলে না। মাথার ওপর একফালি ছাদ, আর তিনদিকে টিনের বেড়া। কোণে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। দারিদ্র্যের আসল চেহারাটা ধীরে ধীরে চোখে পড়ে। ময়লা, আবর্জনা আর ভাঙাচোরা গৃহস্থালী নিয়ে এখানকার পৃথিবী।

মেঝের একপাশে কাঁথা জড়িয়ে মহিলাটি শুয়েছিল। পায়ের শব্দে চম্‌কে ওঠে। 'কে! কে ওখানে!'

'আমি।'

সাপ দেখেও মানুষ এমন আঁতকে ওঠে না। রীতিমত আর্তনাদ ক'রে উঠল মহিলাটি, 'আবার তুই আমার সামনে এসেছিস, পোড়ারমুখী। যা, যা—সরে যা!'

'তোমার অসুখ কেমন, দেখতে এলাম।'

'আ রে দরদ! কেন, আমি তোদের খাই, পরি! বড় যে সন্ধ্যেবেলা আজ জ্বালাতে এলি।' মহিলাটি দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'তোরা বাপ-মেয়ে সুখে থাক্‌গে। নরক ছেড়ে দিয়ে আমি তো আলাদা হ'য়েই পড়ে আছি।'

'ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলাম। তোমার সেই বুকের ব্যথাটা—'

'না, না, দরকার নেই। তুই যা আমার চোখের ওপর থেকে।' বলতে বলতে উত্তেজনার প্রাবল্যে হাতের কাছে একটা লোহার বাটি ছিল, মহিলাটি তাই মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারলে। গায়ে না লেগে সিমেণ্টের ওপর সশব্দে বাড়ি খেয়ে বাটিটা একপাশে ছিট্‌কে যায়। তারপর শুনলাম চাপা, রুদ্ধ কান্না, 'আমি তোর ছায়া দেখতে চাই নে···আমায় এখানে মরতে দে—'

হতভম্ব হ'য়ে গেলাম।

মেয়েটি আঁচলে চোখ মুছল।

তারপর সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না, সঙ্গতও হত না। আবার সেই আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ ঠেলে পথ দেখিয়ে আমাকে তার ঘরে নিয়ে এল। পাতাল থেকে উঠে এলাম, মনে হয়।

'দেখলেন মার কাণ্ড!'

'হ্যাঁ। তা কি হয়েছে, বলুন তো!' মেয়েটির মুখের দিকে তাকাই।

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও আস্তে আস্তে বললে, 'পাগল। অসুখে ভুগে মার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।'

চুপ ক'রে থাকি।

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, অসুখে ভুগে মানুষ পাগল হয়?'

'তা হ'তে পারে।' গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমি এখন যাই।' আবহাওয়াটা এমন বিশ্রী ঠেকছিল।

'ও কি, বসবেন না!' মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে উঠল, ফিরে এল তার চঞ্চলতা।

'না, সময় নেই।' চৌকাঠের দিকে পা বাড়াই।

'পান খেয়ে যান।' করুণ, বিষণ্ণ মুখে শেষ পর্যন্ত একটু হাসি টানবার চেষ্টা ছিল, লক্ষ্য করলাম।

সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে নেমে পড়ি।

বাইরে এসে অসুবিধা হয়। কোনোদিন এদিকে আসি নি। কোন্ দিক দিয়ে যে লোকটা আমাকে টেনে এনেছিল, আর কোন্ রাস্তা দিয়ে বেরোতে হবে, খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। গলির মাথায় এসে চম্‌কে উঠলাম। গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ভীষণভাবে কাশছে। আমাকে সামনে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'হ'য়ে গেল, এরই মধ্যে ফিরে এলেন!'

'হ্যাঁ, তা কি করতে হবে আমায়!' ওর মুখের দিকে তাকাই। কিছু বুঝতে পারি না।

'তা এও একটা কথা বটে! সকলের পছন্দ তো একরকম নয়!' আপন মনে কি কতগুলো বিড়বিড় ক'রে।

ভদ্রলোক ফস্ করে আমার হাত চেপে ধরল, 'যাক্‌গে, কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—তা, মিনিট দশেক ছিলেন ত'!'

'তা ছিলাম বইকি!' সন্দেহ হ'ল এও পাগল কিনা। বললাম, 'কি চান আপনি?

'এক-আধটা গান-টান শোনালে তো?'

'হ্যাঁ, আপনার মেয়ে নাচলে গাইলে—' লোকটা পাগল তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না, বললাম, 'এবার পথ ছেড়ে দিয়ে আমায় যেতে দিন।'

'আহা, রাগ করছেন ডাক্তারবাবু!' হাত ধ'রে ভদ্রলোক করুণ চোখে তাকাল। 'আমার অবস্থা জানেন তো, চাকরি-বাকরি নেই। দুটো টাকা আমাকে দিয়ে যেতেই হবে!'

বিষ

'ওটা বন্ধ করে দাও, মা।'

'কেন ভাল লাগছে না?'

'না—নাঃ।'

চারুশীলা উঠে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসলেন। কি একটা সেলাই করছিলেন। কিন্তু তখনই সেটা আবার হাতে নেন না। সেটার দিকে চোখ যদিও—তাকিয়ে একটা সময় ভাবেন।

'খেলা খুব ভাল হচ্ছে বলে মনে হয় না, শুনলাম তো কতক্ষণ।'

চারুশীলা চোখ তুলে ছেলের মুখের দিকে তাকান।

'কার খেলা ছিল?'

'এরিয়ান্স রাজস্থান।'

'তা শেষ তো হয়নি, শেষ না হলে খেলার হার-জিৎ বোঝা যায়?' চারুশীলা ম্লান হাসলেন।

মাধব মা-র চোখের দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্ষীণ গলায় হাসল।

'না তা অবশ্য বোঝা যায় না, লাস্ট হুইসেল পড়ার সময়েও গোল হতে পারে।' বলে মাধব দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। আধশোয়া হয়ে বসে হাতের তেলোর ওপর চিবুক রেখে খেলার খবর শুনছিল, রেডিও বন্ধ হতে মাথাটা বালিশের ওপর এলিয়ে দিল। চারুশীলা কথা না বলে সেলাইটা হাতে তুলে নেন।

'মা!'

'কি?' চারুশীলা আবার চোখ তুললেন, কি বলতে গিয়ে ছেলে থেমে আছে।

'কি বলছিলি?'

'না, এমনি হঠাৎ মনে পড়ল।'

'কি মনে পড়ল?' চারুশীলা প্রশ্ন না করে পারেন না।

'আচ্ছা হরিয়াল বেশি সবুজ না টিয়া পাখি? কার সবুজ বেশি সুন্দর—হ্যাঁ তোমার কাছে, তোমার চোখে?'

চারুশীলা অবাক হয়ে ছেলের মুখ দেখেন, একটু সময় প্রশ্নটা ভাবেন, তারপর অবশ্য আর অবাক হন না, শান্ত ঠাণ্ডা গলায় হাসেন: 'কি জানি আমি তো অত ভাল করে দেখিনি কোন্‌টা ঠিক—'

'আহা ছাখনি সেটা কথা নয়, তার জন্যে কিছু না,—এখন এখানে ঘরে বসে অবশ্য তুমি হরিয়াল টিয়া কোনোটাই দেখতে পাচ্চ না, কিন্তু একটু বাইরে গেলে, আমি বলছি শহরের বাইরে গেলে তুমি ওদের অনায়াসে দেখতে পাও,—নয় কি?'

ব্যথা পেয়ে চারুশীলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন মুহূর্তের জন্য, তারপর মনে পড়ে কার জন্য মাথা নাড়া, কে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে মুখে বলেন, 'হ্যাঁ।'

'আমি তো আর কোনদিন দেখব না, দেখতে পাব না। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার মনে আছে কি না।' থেমে মাধব ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল, থুতনিটা সিলিং-এর দিকে তুলে ধরা। প্রশস্ত সুঠাম কপালে দুটো রেখা গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। যন্ত্রণার চিহ্ন, অস্বস্তির দাগ—যেন কি মনে করার চেষ্টা করে মনে আনতে না পেরে ও এমন ছটফট করছে। চারুশীলা বোঝেন। বুঝতে পেরে তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের পিঠ দিয়ে তা মুছে ফেললেন।

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।' মাধবের মুখ প্রসন্ন হ'ল, কপালের রেখাগুলো সরে গেছে। 'হরিয়ালই দেখতে বেশি সুন্দর। আমি

রঙের কথা বলছি, সবুজ, কিন্তু টিয়ার মতন নয়, অত কচি কাঁচা সবুজ না, কেমন হলুদ সবুজ, না মা ?'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।' চারুশীলা বড় করে বলেন, 'ঠিক মনে আছে তোর, হরিয়ালই দেখতে বেশি সুন্দর।'

একটু সময় চুপ থেকে মাধব আবার ভাবে। সিলিং-এর দিকে তুলে ধরা থুতনি। স্বামীর মুখের আদল। কপাল ও থুতনিটা এক রকম। বুকের মধ্যে ছোট একটা ধাক্কা অনুভব করেন চারুশীলা। সাত বছর আগে স্বামী স্বর্গীয় হয়েছেন। রংপুর কালেক্টরীতে চাকরি করতেন। মাধব সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। পড়াশোনায় ভাল। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পরীক্ষায়। একটা অঙ্ক ভুল না করলে জগদীশবাবুর ছেলের ওপরে ওর নম্বর থাকত। হ্যাঁ, সেজন্যই সেদিন চোখের সামনে দপ্ করে আলোটা নিভে (পিঠে একটা কার্বাঙ্কল হয়ে স্বামী মারা যান) যাওয়ার পরও চারুশীলা মনে করেননি সব আশা ফুরোলো। ছেলেকে নিয়ে চারুশীলা এখানে ভাইয়ের বাসায় চলে আসেন। কলকাতার স্কুল থেকে মাধব প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করল। গেজেটে মাধবের নামের পাশে স্টার দেখা গেল। দেখে সবাই খুশি—মামা মামী মামার ছেলেমেয়েরা। চারুশীলা মনে মনে ঠাকুরকে ডাকলেন। তাও তিনি শুনলেন। পনেরো টাকা জলপানি পেল মাধব। বাড়িতে ধুমধাম পড়ে গেল। চারুশীলার দাদা সুরেশবাবু এত খুশি এত গৌরব বোধ করলেন যে অফিসের চার পাঁচজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে মাছ ভাত খাওয়ালেন, আর বার বার বললেন, 'অসময়ে ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর বুকটা ভারি দমে গিয়েছিল, আমি বোনের মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। কিন্তু আজ আবার আমি বুকে বল পাচ্ছি, মনে জোর পাচ্ছি। আমার ভাগ্নে আমার মুখ উজ্জ্বল করল, আমার বোনের দুঃখ সত্যি এবার ঘুচবে।' বন্ধুরা দাদার কথায় সায় দিয়েছিল : 'নিশ্চয়, সংসারে যাঁরা সৎ

যাঁরা সাধু তাঁরা পৃথিবীতে তা ছাড়া মন্দ কিছু তো আনতে পারেন না। ত্রৈলক্যবাবু অসময়ে গেছেন কিন্তু কি রেখে গেলেন স্ত্রীর জন্য, আপনারা পাঁচজন আত্মীয়ের জন্য। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ফ্যালেন্স তো বড় কথা না। ছেলেটি যে ভাল হয়েছে, একটি রত্ন হয়েছে সেটাই বড় কথা। আশার কথা। গাছ মরলে কি হয়—ফলকে কেউ মারতে পারে না, বিশ্বের কোনো দুষ্ট শক্তিই একে সংহার করার ক্ষমতা রাখে না।' দরজার আড়ালে থেকে চারুশীলা শুনলেন। নিজে একদিন অফিস কামাই করে দাদা মাধবকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন। কিন্তু কে জানত, কে জানে এমন করে চারুশীলার কপাল পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সারাদিন বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে থাকে তাই চোখটা একটু খারাপ হয়েছে—ও কিছু না। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে একটা চশমা করিয়ে দিলেই হবে। অল্প বয়স। হয়তো কিছুকাল নিয়মিত চশমা চোখে রাখলে দোষটা আপনা থেকে সেরে যাবে। অনেকেরই গেছে। পরে আর চশমা লাগে না। মাধবের চশমা নেওয়া হল। কিন্তু পড়াশোনা একেবারে বন্ধ রাখলে চলে কি? সামনে পরীক্ষা। বি. এ. ফাইন্যাল। খারাপ চোখ নিয়ে চলল পড়াশোনা। আর একবার ডাক্তার দেখিয়ে পাওয়ার বদলানো হল। উঃ, সে কি অসম্ভব পুরু কাঁচ। একদিন চোখের সামনে ছেলের চশমাজোড়া ধরে নিয়ে চারুশীলার মনে হয়েছিল তাঁর চোখ যাবে। ভয়ে ভয়ে চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চারুশীলা কতক্ষণ গুম হয়ে বসে ছিলেন। মানুষের চোখের ব্যারাম সম্পর্কে নানা কথা শুনেছিলেন তিনি। ভয়ে দুর্ভাবনায় তাঁর বুকের ভিতরটা এক একবার হিম হয়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষায় পাশ করল মাধব। মোটামুটি রকম। কিন্তু তা তো কথা নয়, চোখ? একদিন বিকেলে এই ঘরে বসে কাগজ পড়তে মাধব হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠল: 'মা! মা!' চারুশীলা বাথরুমে ছিলেন। ছুটে বেরিয়ে ছেলের সামনে দাঁড়ালেন 'কি হল? কি

হয়েছে—আলো কমে গেছে, এখন কাগজ পড়ার কি দরকার?' চারুশীলা ধমক দিলেন। কিন্তু সেই অল্প আলোয়ও চারুশীলার চোখে পড়ল মাধবের দুহাত থরথর করে কাঁপছে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে: 'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে মা, সব অন্ধকার লাগছে—সত্যি কি রাত হ'ল, তুমি সুইচটা টেপ তো—' ত্রস্ত কম্পিত পায়ে চারুশীলা ছুটে গেলেন দেয়ালের সুইচ বোর্ডের কাছে, জ্বালালেন আলো, ঘাড় ফেরালেন: 'এখন কেমন লাগছে, দেখছিস?' 'না না মা—উঃ সব—'

পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। বাকি জীবনের মত চারুশীলারও চোখের আলো নিভল। কাঁদলেন, আজও কাঁদছেন। আজ চার বছর। চিকিৎসা যা করার তার চূড়ান্ত হয়েছে। গত আশ্বিনেও চোখ অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই ফল হয়নি। স্বামীর লাইফ ইন্সিওরের পাওয়া দু হাজার টাকা এবং চারুশীলার গায়ের গহনাগাটি যা তোলা ছিল (মাধব বিয়ে করলে বৌকে দেবেন ঠিক করে রেখেছিলেন) সব গেছে। খাচ্ছিলেন অবশ্য দাদারটাই এখনও খাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও যে সুরেশবাবু বিধবা বোন ও তার একমাত্র সন্তান এমন অসহায় অন্ধ হয়ে ঘরে বসে থাকলে দু মুঠো ভাত দিতে কুণ্ঠিত হবেন তা না। ছেলেদের আমলে কি হবে তা নিয়ে চারুশীলা অবশ্য আজও মাথা ঘামান না। না, দাদা যতখানি করেছেন এবং এখনও করছেন তার তুলনা হয় না। কটা ভাই অতটা করে চারুশীলা জানেন না।

'মা!'

'কি?'

'একটা জিনিস আজও আমার চোখে লেগে আছে, 'একটা সন্ধ্যার ছবি।'

'বলো।' দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন চারুশীলা। বরং শব্দ করে হাসলেন। 'কোথাকার সন্ধ্যা,—কলকাতার? রংপুরের?'

'উহু।' মাধব মাথা নাড়ল। 'সেবার আমরা ফার্স্ট ইয়ারের ক'জন বন্ধু মিলে মধুপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'কেন মনে থাকবে না, গ্রীষ্মের ছুটিতে, না?'

'ধেৎ!' মাধব ক্ষীণ গলায় হাসল।

অপ্রস্তুত হয়ে চারুশীলা একটু ভাবলেন।

'গুড্ ফ্রাইডের ছুটি ছিল সেটা। চারদিকে তখন ভীষণ পক্স হচ্ছিল—তুমি বারণ করেছিলে বাইরে যেতে—মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ—এইবার মনে পড়েছে। খুব সুন্দর জায়গা, এসে বলেছিলি।'

'আহা তা তো বলেইছিলাম, একবার না বহুবার। না—আমি বললাম এখন মধুপুরের একদিনের একটা সন্ধ্যার কথা, উঃ দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। চৈত্রমাস, এলোমেলো হাওয়া, মহুয়ার গন্ধে ভুর ভুর করছে চারিদিক—না, আমি কিন্তু সে সব বলব না —শোন মা, আমার দিকে তাকাও—'

'তাকিয়েছি, তুই বল।'

'আমার মনে হয় তুমি আমাকে দেখছ না, সেলাই করছ।'

না রে, আমি তো কখন সেলাই রেখে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। হ্যাঁ, কি বলছিলি?'

'বিকেল বেলা, চার বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছি, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে গেছি, সেই পূব পাহাড়ের ধারে। একটা চিলতে নদী আছে সেখানে, জলের চেয়ে বালি বেশি, তোমায় বলেছি।'

'হ্যাঁ শুনেছি।'

'তার ওপর চৈত্র মাস, বুঝতেই পার, ধূ ধূ করছে নদীর বুক—রমেন কবিতা টবিতা-লিখত—বলল, হতাশ প্রেমিকের মত দেখাচ্ছে পাহাড়ী নদীটাকে। শুনে সবাই হাসলাম। বীরেন সংশোধন করে বলল, নদী স্ত্রীলিঙ্গ—সুতরাং হতাশ প্রেমিকা হবে। আবার হাসির ধুম। সব বললেও এ-কথাটা তোমায় আমি বলিনি কোনোদিন,—আজ অবশ্য আমি বড় হয়েছি, বড় ছেলে তোমার—চব্বিশ বছর বয়স

কি কম মা? এখন আর এসব বলতে লজ্জা করা উচিত না, কি বলো?'

নরম গলায় মা একটুখানি হাসলেন কেবল।

'কত আর বয়স তখন আমাদের—তখনই এসব আলোচনা চলত, হি—হি—।'

চারুশীলা এবারও কোনো কথা।

'হ্যাঁ যাকগে, কি বলছিলাম, সন্ধ্যার দৃশ্য—পিছনে আগুন ছড়ানো পলাশের জঙ্গল আর ওদিকে কুমকুম ছিটানো পশ্চিমের আকাশ—দৃশ্যটা দেখে সত্যি আমরা কতক্ষণ কোনো কথা বলতে পারিনি। এত রং পৃথিবীতে আছে।'

চারুশীলা স্থির চোখে ছেলের মুখ দেখেন। চুপ থেকে আবার কি ভাবছে ও। কপালে কুঞ্চন। যেন আবার একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে—মাথায়? বোঝা শক্ত। চারুশীলা কি করে বুঝবেন সব রং সব আলো চোখের সামনে থেকে মুছে যাওয়ার যন্ত্রণা কেমন কোথায় ওর লাগছে বেশি। উঠে ছেলের বিছানার পাশে বসে চারুশীলা তার কপালের ওপর আস্তে একটা হাত রাখলেন। একটু সময় মাধব মার হাত ধরে রইল?

'দুধটা তো খাওয়া হয়নি, এখন খাবি?'

'সে রকম যেন ক্ষুধা হচ্ছে না আজ',—মাধব একটু থেমে পরে বলল, 'বরং ভিটামিন বড়িটা দাও, খেয়ে ফেলা যাক।'

'দুধ খেয়ে তো ওটা খাবার কথা।' বিড় বিড় করে বললেন চারুশীলা, তারপর উঠে টেবিল থেকে একটা শিশি নিয়ে এলেন।

'দাও।' হাত বাড়িয়ে শিশিটা নেয়, আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্দাজে ছিপিটা খুলে ফেলে, তারপর একটা বড়ি বার করে সেটা মুখে ফেলে দেয়। 'নাও।'

শিশি হাতে নিয়ে এবার চারুশীলা ছিপি আঁটেন তারপর সেটা টেবিলে রেখে আসেন।

'একটা সিগারেট দাও মা।'

শিয়রের পাশ থেকে বাক্সটা তুলে চারুশীলা সিগারেট বের করে ছেলের হাতে দেন। মাধব সেটা ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে অপেক্ষা করে। চারুশীলা দেশলাই জ্বেলে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেন। আগে মার সামনে সিগারেট খেত না মাধব। এই অবস্থায় পড়েও। চারুশীলা বাথরুমে কি পাশের ঘরে গেছে টের পেলে সিগারেট বের করে নিজেই হাতের আন্দাজে তা ধরিয়ে টানত,—কিন্তু একদিন বালিশের অড় পুড়ে ফেলে মাধব তা বন্ধ করেছে। ঘরে ঢুকে টের পেয়ে চারুশীলা ছেলেকে ধমকালেন। 'আমার সামনে তুই সিগারেট খাবি, আমাকে ঘরে রেখে সিগারেট খেলে দোষ নেই কিছু।'

তারপর মাধব আর সঙ্কোচ করেনি। তবে মামাবাবু এঘরে আসছেন টের পেলে হাতের সিগারেট ফেলে দেয়।

'ক'টা বাজে মা, সন্ধ্যা হ'ল ?'

'না, এখনো যেন একটু আলো আছে।' চারুশীলা ছেলের শিয়রের দিকের জানালার কালো পর্দার ওপর চোখ রাখেন। ঘরে যাতে কড়া আলো না আসতে পারে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী দরজায়ও পর্দা ঝুলছে। তাই ভিতরটা দুপুর সন্ধ্যা এক রকম।

'বেণু মণ্টু খেলা দেখে ফিরে এলো মা ?'

'মনে হয় না।' চারুশীলা কান খাড়া করে ধরলেন। 'কারও গলা শুনছি না তো।' বেণু মণ্টু দাদার দুই ছেলে। ফার্স্ট ইয়ারে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। আজ বড় খেলা ছিল তাই মাঠে গেছে। 'আহা সোমেশ ব্যানার্জি কী চমৎকার স্কোর করলে—' 'রাধেশ নন্দী পর পর দুটো ভাল শট ফেরালে বলে ওদের ইজ্জত বাঁচল, না হলে আরো দুটো পয়েন্ট নষ্ট হ'ত'—'পি পাল লাস্ট মোমেণ্ট হেড্ করে গোলটা দিলে তো' ইত্যাদিতে এখনি ঘর-বারান্দা মুখর হয়ে উঠবে। খেলার খুঁটি-নাটি প্রত্যেকটা খবর বলতে বলতে বেণু মণ্টু এ ঘরে চলে আসবে। ভিতরে একটা অস্বস্তি নিয়ে চারুশীলা এ সময়টার অপেক্ষা

করেন। অবশ্য কান পেতে মাধবও মামাতো ভাই দুটির কথা শোনে। 'উঃ আজ মাঠে কি ভিড় !' 'বাস্-এ প্রণবের সঙ্গে দেখা হল মাধুদা।' 'কে, অ প্রণব রায়'—মাধব দু'ভায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে। 'আমার বন্ধু—তোমায় বলেছিলাম মা, ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমার কথা কিছু বললে প্রণব ?' 'না, অত ভিড় গাড়িতে কথা বলা যায় ?' মণ্টু ঘাড় নাড়ে। মাধব কথা না কয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'হ্যাঁ, ভাল কথা মাধুদা—' উত্তেজিত হয়ে বেণু বলে, 'আজ বাস থেকে নেমেছি, দেখলাম আলপনা রায়কে—বাব্বা কী স্টাইল, একটা সিফন পরা, তাই তো মনে হল, কালো কুচ-কুচে রং ব্লাউজ গায়ে—অদ্ভুত ফর্সা রং তাই মানিয়েছে খুব। কানে এত বড় দুটো ঝুমকো—খোঁপায় ডালপাতা সমেত একটা লাল গোলাপ। আমি তো দেখে অবাক। ছবিতে ত' এতবার দেখেছি—কিন্তু আজ দেখলাম গাড়িতে বসা, হ্যাঁ একেবারে চোখের সামনে। প্রকাণ্ড হল্‌দে রঙের গাড়ি,—নিজের গাড়ি হবে, ট্রাফিকের ভিড়ের জন্য স্‌প্ল্যানেডে একটু সময় দাঁড়িয়েছিল।' মাধব নীরব। চারুশীলা নীরব। মাঠে ঘাটে রাস্তায় আর কি কি দেখে এল বলা শেষ করে দু ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে চারুশীলা স্বস্তিবোধ করেন। মাধব ক্ষীণ গলায় হাসে। 'বেশ বকতে শিখেছে দুটি ভাই, কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়।' একটু থেমে মাধব পরে আস্তে আস্তে বলে : 'রাস্তায় বেরোলেই কত হাজার হাজার মানুষ যে ওদের চোখে পড়ে—।' ঠিক এই সময় চারুশীলা মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকান। মাধব হাসল বটে, কিন্তু দেয়াল ঘেরা বিষণ্ণ অন্ধকারে শুয়ে মামাতো ভাইদের মুখে শোনা বাইরের পৃথিবী মনে পড়ে তার বুকের মধ্যে কি রকম করছে—চারুশীলা নিজের বুকের প্রত্যেকটা শিরা দিয়ে তা উপলব্ধি করে স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

'তুমি কি এখনি আহ্নিক করতে উঠবে মা ?'

'না, একটু দেরি আছে।'

'তুমি তো আমার গল্পটা শুনলে না।'

'তুই বল না, আমি শুনতেই বসে আছি যে।'

কিন্তু অন্যদিকে তুমি তাকিয়ে আছো—আমাকে দেখছ না!'

'আশ্চর্য!' ছেলের কথায় চারুশীলা ব্যথা বোধ করেন। 'আমি সারাক্ষণই তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বিশ্বাস কর।'

চারুশীলা ভাল করে ছেলের দিকে ঘুরে বসেন।

'কি জানি', বিড় বিড় করে মাধব নরম গলায় বলল, 'আমার যেন মনে হয়েছিল একটু আগে তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলে।'

'না।' গলায় সবটুকু স্নেহ ঢেলে দিয়ে চারুশীলা আবার ছেলের কপালের ওপর হাত রাখেন। কপাল থেকে সরিয়ে হাতটা কাঁধের কাছে নেন, তারপর সেই হাত দিয়ে তিনি ওর পিঠ পরীক্ষা করেন। 'খুব ঘাম হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, চাদরটা কেমন আঠা লাগছে পিঠে।'

হাত বাড়িয়ে চারুশীলা একটা তোয়ালে টেনে আনেন। 'পাশ ফিরে শো তো বাবা, আমি মুছে দিই পিঠটা—'

মাধব পাশ ফিরে শোয়।

'পাখাটা চালিয়ে দেব?' চারুশীলা প্রশ্ন করেন।

'দাও।'

চারুশীলা উঠে হাত বাড়িয়ে টেবিলফ্যান্‌টা চালিয়ে দেন। সুরেশবাবুর বাড়ির কোনো ঘরে পাখা নেই। সব সময় ঘরে আটকা আছে বলে তিনি ভাগ্নের জন্য এই পাখা ভাড়া করে এনেছেন। কিন্তু তা হলেও মিটারের অতিরিক্ত খরচের কথা ভেবে চারুশীলা খুব সাবধানে সেটা ব্যবহার করেন।

'এতক্ষণ বেশ লাগছিল।' মাধব নিজের চুলের মধ্যে হাত গুঁজে দিল। 'সন্ধ্যেবেলাটায় কেমন গুমট গুমট লাগে, বিশ্রী লাগে।'

কথা না বলে চারুশীলা তোয়ালে দিয়ে ছেলের কাঁধের নিচ পিঠ

কোমর বগল দুটো ভাল করে মুছে দেন। 'লুঙ্গিটা এখন ছাড়বি ? আমি তো বাথরুমে যাব ধুয়ে আনব।'

'নাঃ থাক্, দুপুরে তো পরেছি এটা। ধোয়া লুঙ্গি না ?'

'হ্যাঁ', চারুশীলা তোয়ালেটা সরিয়ে রেখে আলস্যভঙ্গের হাই তুললেন। 'কাল বিকেলে যেটা ছেড়েছিলি ধুয়ে রেখেছিলাম, সেটাই তো দুপুরে পরা হয়েছে।'

'তবে আর কি।' বিড়বিড় করে মাধব বলল, 'আমি অন্ধ হয়ে তোমার কাজ বাড়িয়েছি মন্দ না।'

'ছিঃ কি বলছিস!' চারুশীলা ধমক দেন। 'কি এমন কাজ আমার বেড়ে গেল তার জন্যে। তা ছাড়া সারাদিন বসে থেকে আমি করব কি, বিধবা মানুষ, ওদেরটাও তো সব সময় ধরতে ছুঁতে পারিনে। আর একটা কথা—'

'কি কথা বলো মা, থামছ কেন।' গলার একরকম বিকৃত সুর করে মাধব হাসল। চারুশীলা কেমন চমকে উঠলেন, একটু ভয় পেলেন। কথাটা তো নতুন না, আজ প্রথম তিনি বলছেন না, মাধব আঁচ করেছে যদিও ঠিক—কিন্তু তা হলেও—

'বলো।'

'ওরকম করছিস কেন।' চারুশীলা নিজেকে শক্ত করেন। 'তাছাড়া মিথ্যে কি, তুই কি অন্ধ হয়ে জন্মেছিলি বড় যে অন্ধ অন্ধ বলিস। চোখ খারাপ হয়েছে, চিকিৎসা তো এখনো বন্ধ হয়নি, নিশ্চয় সারবে, হয়তো সময় লাগবে, হয়তো একটু বেশি সময়—'

'তাই ভাল, তোমার বিশ্বাস মা,—' বালিশের ওপর মাথাটা নেড়ে নেড়ে তেমনি বিকৃত স্বরে, ঠাট্টার সুরে, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাধব হাসতে লাগল: 'আমি যদি তোমার সেই সাত বছরের ছেলেটি থাকতাম তখন একথা বললে—হা-হা—'

চব্বিশ বছরের যুবক! যখন তোয়ালে দিয়ে ছেলের পিঠ মুছে দিচ্ছিলেন, ঘাড় মুছে দিচ্ছিলেন চারুশীলার হাত কাঁপছিল। এ তো

কথা ছিল না, এর ভার নিত আর একজন। ষোল বছরের একটি মেয়ে, সতের বছরের একটি তরুণী, খুব বেশি যদি হ'ত তো না হয় উনিশ কুড়ি বছরের কোনো যুবতী। কিন্তু তা আর হল কোথায়। কাঁথা, অয়েলক্লথ ধোয়াতে ধোয়াতে চারুশীলা মাধবের দেড় বছর বয়সের সময় যে অসহায়তা, ভয়, দুর্ভাবনা, অশ্চিয়তাকে সামনে রেখে দিন সপ্তাহ মাস বৎসর গুণে গুণে কাটাতেন, আজ ছেলের চব্বিশ বছর বয়সে তাই করছেন।

'মা, আমার গল্পটা শুনবে?'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ না হয় এমনভাবে নিশ্বাস ফেলে চারুশীলা মেরুদাঁড়া সোজা করে বসলেন। একটা ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বসে কাটিয়ে তাঁরও ক্লান্তি এসেছে, বিশ্রী একটা মাথাধরা ভাব সব সময়। 'বলো, আমি শুনছি।'

'না, বলছিলাম এক একটা ছবি চিরকালের মতন যেন চোখে লেগে আছে। সূর্যাস্তের আবির খেলা দেখলাম আমরা, পলাশবনের আগুন দেখে শেষ করলাম। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। চার বন্ধু উঠব উঠব করছি, হঠাৎ পূব দিকে চোখ পড়াতে আর ওঠা হল না। এত বড় চাঁদ মা।' দু'হাত শূন্যে তুলে ছেলেমানুষের মতন মাধব চারুশীলাকে চাঁদের আকৃতি দেখাল। 'রং? মনে হচ্ছিল রুপোর থালায় কে হলুদ মাখিয়ে রেখেছে।'

'পূর্ণিমার পরদিন থেকে চাঁদ ঐ রং ধরে।'

'তাই হবে।' মাধব মাথা নাড়ল। 'পূর্ণিমার পরদিন যেন ছিল সেটা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তো চাঁদ উঠলো দেখলাম। একটু থেমে মাধব বলল, 'তারপর শোন মা। কি খেয়াল হতে আমরা পলাশবনের দিকে ঘাড় ফেরালাম। আর চেনা গেল না। মনে হচ্ছিল অন্য কোনো ঝোপঝাড়। ফুলটুল কিচ্ছু ফোটে না। কিন্তু পাশেই আর দুটো গাছ চোখে পড়ল। ইউকিলিপটাস। এর কাণ্ড সাদা তো। হলুদ হলুদ জ্যোৎস্নায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল গাছ

দুটোকে। দেখে তখনি সেই রমেন ছোঁড়ার কাব্যরস জাগল। বলল, দুটি তন্বী কিশোরী। চাঁদের আলোয় নিরিবিলি বনের ধারে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে—হা-হা।'

আবার এত জোরে ও হেসে উঠল যে চারুশীলা চমকে ওঠেন।

'মনে পড়ে সেদিনের সেসব কথা, সেই দৃশ্যগুলো—শুয়ে শুয়ে ভাবি।' মাধবের হাসির বেগ কমল। 'রমেন উপমাটা সুন্দর দিয়েছিল, না মা?'

'হ্যাঁ।' শান্ত গলায় চারুশীলা সায় দেন। 'তোদের রমেন এখন কোথায়, কি করছে?'

'জানি না, বোম্বে-টোম্বের দিকে আছে, হ্যাঁ, চাকরিই করছে শুনেছিলাম। বি. এ. পরীক্ষার আগেই চাকরি পেয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাধব পরে বলল, 'বেরোতে পারিনি, বন্ধু-বান্ধব কেউ আসেও না যে সকলের খোঁজ-খবর পাব।'

চারুশীলা কথা বললেন না। একটু পর তিনি আস্তে আস্তে খাট ছেড়ে উঠলেন: 'এইবেলা আমি আহ্নিকটা সেরে আসি বাবা।'

'যাও, দেরি কোরোনা।'

'আমার এখনি হয়ে যাবে।'

চারুশীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মাধব কান পেতে রইল। বাইরে কোনদিকে যেন একটা কাক শেষ বারের মতন ডাকতে ডাকতে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। রাস্তায় ঘুগনী-ওয়ালা এসেছে, ছোট ছেলেদের কলরব শোনা যাচ্ছে। যেন একটা মোটর গাড়ি চলে গেল। ট্যাক্সী? প্রাইভেট কার? সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বেণু মন্টু ফিরল কি? না, মামাবাবু। ভারি জুতোর শব্দ। এদিকে আসছেন। দরজার দিকে শব্দটা এগিয়ে আসছে। 'মাধু ভাল আছো?' 'হ্যাঁ মামাবাবু, অফিস থেকে এই ফিরলেন?' 'হ্যাঁ বাবা, একটু বাজার করে আনতে হ'ল, দেরি হয়ে গেল।' 'মাছ?' 'হ্যাঁ, মাছ এনেছি, সবাই খাক না খাক তোর জন্য

তো দু টুকরো আনতে হবে। মাছ কি বাজারে আছে! আর কি অগ্নিমূল্য! হ্যাঁ, ইলিশই আনলাম, কি করি। চারু কোথায়?' 'আহ্নিক করতে ছাদে গেছেন।' 'আচ্ছা আমি এখন যাই, সন্ধ্যার পর তোর পাশে এসে আমি বসব একবার—গল্প করব।' 'আচ্ছা।' মাধব ক্ষীণ হাসল। জুতোর শব্দ ওদিকে সরে গেল। মামীমার গলা। 'আলু?' 'হ্যাঁ, আলু আনা হয়েছে।'

'মাধু!'

'মা।'

'আমার হয়ে গেছে, আমি এসেছি।'

'এসো, এইবেলা ভাল করে আমার পাশে একবার বসো তো বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। গল্প কর। একলা শুয়ে থাকতে এমন খারাপ লাগে।'

'একটু দুধ খেয়ে নে এইবেলা।'

'না না, মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না। মামাবাবু মাছ এনেছে। রান্না হোক। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।'

'দেরি হবে যে।'

'হোক দেরি। তুমি এসো এখানে।'

চারুশীলা ছেলের পাশে বসলেন।

'পা গুটিয়ে বসেছো!'

'হ্যাঁ রে বাবা।'

'কই দেখি।' মাধব হাতড়ে হাতড়ে পরীক্ষা করল মা পা গুটিয়ে বসেছে কি না। 'ঠিক আছে।' নিশ্চিন্ত হয়ে পরে হাতটা সে সরিয়ে নিলে। চারুশীলা আবার একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'মা!'

'বলো।'

'আচ্ছা, ফর্সা মেয়ের গায়ে কালো জামা সুন্দর লাগে। লাল রংটাও তো খুব মানায়, না?'

'হ্যাঁ।' চারুশীলা ঢোক গিললেন। 'গায়ের রং ফর্সা হলে সব রংই মানায়।'

'তাই।' একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল মাধব। একটু সময় চুপ থাকল, পরে আস্তে আস্তে: 'আমাদের কলেজের রেবাকে মনে পড়ছে। দুধের মতন সাদা রং। তার ওপর পরত টক্‌টকে লাল ব্লাউজ। কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাত মেয়েকে।'

চারুশীলা কোন মন্তব্য করলেন না।

'আচ্ছা মা, শ্যামলা রং, কি যেন নাম—আঃ মনে পড়ছে না— সুমিতা? সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ত। সায়ন্স। সুমিতা, চামেলী, রুমা? এখন মনে পড়েছে। কি আশ্চর্য! কলেজের বিখ্যাত শ্যামলা রঙের সুন্দরী মেয়ে দময়ন্তীর নাম আমি মনে করতে পারছিলাম না। চোখের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও কি নষ্ট হয়ে গেল? দময়ন্তী পরে আসত স্বর্ণচাঁপা রঙের শাড়ি। রংটা চোখের উপর ভাসছে। চমৎকার মানাত। আর মনে আছে ওর খোঁপা। কপাল কানের ওপর থেকে টান টান করে সব চুল একত্র করে নিয়ে কালো পাথরের বাটির মত এত বড় খোঁপা। লম্বা ঘাড়। তাই আরো সুন্দর লাগত।'

'সেই মেয়ের কি—' কি যেন একটু ইতস্তত করে চারুশীলা পরে প্রশ্ন করলেন, 'বিয়ে হয়ে গেছে?'

মাথা নাড়ল মাধব।

'জানি না—কি করে খবর পাব,—কারো সঙ্গে দেখা করার কারওর দেখা পাবার অবস্থা কি আমার আছে।' চুপ থেকে মাধব অল্প হাসল। 'আচ্ছা মা, এখন যেমন মেয়েরা পঞ্চাশ রকমের বেণী খোঁপা বাঁধে তোমাদের আমলে কি এত ছিল?'

'না, আমরা দু-এক রকমের সাদাসিধে খোঁপা বেণী করতাম।' চারুশীলা মৃদু গলায় হাসলেন: 'এটা আধুনিক যুগ।'

'তবে এটাও একটা আর্ট—শিল্প, চুলের হরেক রকম সাজগোজ

করা।' মাধব থামল, তারপর বলল, 'রুমার চুল ছিল একটু লালচে রঙের, কিন্তু তা-ও যেন ভাল লাগত দেখতে। রংটা ভাল ছিল তো, গোলাপের মত টকটক করত মুখখানা।'

কি একটু চিন্তা করে চারুশীলা আস্তে আস্তে বললেন, 'বাবা, আমি একটু ওদিকে যাই,—কিচ্ছু করব না, তোমার মামীমা একলা রান্নাবান্না করছেন একটু ঘুরে দেখে আসব শুধু।'

যে কথা বলতে চাইছিল মাধব তা মুখে আটকে গেল। একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'উঠব বাবা?' চারুশীলা ফের অনুমতি চাইলেন।

মাধব হাতড়ে হাতড়ে মার পায়ের ওপর একটা হাত রাখল। শুধু রাখল না, একটু শক্ত করে ধরে রইল।

'মা!'

'কি?'

'আজ দু-তিন দিন ধরে এটা হচ্ছে,—তুমি কাছে না থাকলে একলা থাকলে মন এমন খারাপ লাগে। বিশ্রী।'

ছেলের হাতের ওপর হাত রাখলেন চারুশীলা, শান্ত গলায় বললেন, 'কেন মন খারাপ করবি; চিকিচ্ছে তো এখনো বন্ধ হয়নি, নিশ্চয়ই—'

'সে কথা বলছিনে, খারাপ মানে খুব খারাপ খারাপ চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকে জট পাকাতে থাকে।'

চারুশীলা হঠাৎ কিছু বুঝতে পারেন না। চুপ করে থাকেন।

'বুঝলে মা, তখন আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না। মাথাটা কেমন গরম হয়ে নিজের চুল নিজে ছিঁড়ি, নিজের হাত নিজে কামড়াই,—উঃ!'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন চারুশীলা। একটা আতঙ্কের পিণ্ড বুকের মধ্যে গলার কাছটা যেন চেপে ধরে তাঁর। চোখ না, অন্য চিন্তা, অন্য বিশ্রী বাজে ভাবনায় মাথা গরম হয়ে ওঠে, অস্থির করে তোলে

আমাকে—তবে কি। যেন কিছু একটা আঁচ করতে পেরে সংযত কোমল স্বরে চারুশীলা বললেন, 'যখন এমন হয়, তখন ভগবানকে ডাকবে, মনের অস্থিরতা থাকবে না।'

'বুজরুকী।' গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করল মাধব। 'ভগবান তোমাদের জন্যে মা, আমার না, আমার যদি ভগবান থাকত তবে কি আর চোখের এ-দশা হয়—বলো, চুপ কেন, আমার কথার উত্তর দাও।' যেন একমত হতে না পেরে মার ওপর রেগে গিয়ে মাধব চারুশীলার পা থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

চারুশীলার বুকের ভিতর চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

'মা!'

'মাধব!'

'কথা বলছ না কেন, তুমি কি বোবা।'

চারুশীলা আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন।

'আর কি-ই বা বলবে।' কেন নিজের মনে বলতে লাগল মাধব: 'পাঁচ বছরের খোকা তো নই, চব্বিশ বছরের ছেলের মনকে কি বলে তুমি শান্ত করবে তা-ও একটা কথা বটে।'

চারুশীলা নীরব।

মাধব অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'যাও, এখানে ভূতের মতন বসে থাকলে কি হবে। মামীমা একলা হাতে ওদিক সামলাচ্ছেন ঘুরে একটু দেখে এসো গে—যাও।'

তবু চারুশীলা উঠছেন না, উঠতে শক্তি হারিয়েছেন।

'যাও, দেখি না একলা কিছুক্ষণ থেকে, যদি সেই খারাপ চিন্তাগুলো আসে তোমার ভগবানকে আজ ডেকে দেখি মন শান্ত হয় কি না, বাজে ভাবনাগুলো দূর হয় কি না পরীক্ষা করা যাবে।' বিদ্রূপের সুরে মাধব হাসল। 'যাও ওঠ।'

চারুশীলা খাট ছেড়ে উঠলেন।

ঘর ছমছম করছে অন্ধকারে।

'আলোটা জ্বেলে যাব?' শেড্ পরানো একটা টেবিলল্যাম্প এনে দিয়েছেন সুরেশবাবু এ-ঘরের জন্য। দরকার হলে চারুশীলা জ্বালেন।

'দরকার নেই।' তেমনি অসহিষ্ণু স্বর মাধবের। 'তুমি কি ঘরে থাকছ এখন যে এটা ওটা করতে আলোর দরকার। আমি আলো দিয়ে করব কি—যাও।'

চারুশীলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

দশ মিনিট পর কি তারও একটু আগে কেমন যেন ব্যস্ততা, একটা খুশির ভাব নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। 'মাধব! মাধব!'

ছেলের কোনো সাড়া পেলেন না চারুশীলা। একটু অবাক হলেন, তা হলেও সেটা গায়ে না মেখে চাপা উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, 'ও-বাড়ির গীতা গান গাইছে, শুনছিস, দাঁড়া আমি পর্দাটা সরিয়ে দিই।'

বলতে বলতে তিনি জানালার কাছে সরে গেলেন।

কিন্তু পর্দা সরাবেন কি জানালার দুটো পাল্লা বন্ধ এবং হাত দিয়ে টের পেলেন, ছিটকিনিটা পর্যন্ত বেশ ভাল করে আটকে দেওয়া হয়েছে!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চারুশীলা।

কি করে ওটা বন্ধ করতে পারল ও!

এক পা এক পা করে চারুশীলা ছেলের বিছানার পাশে এলেন।

'মাধব! মাধব!'

সাড়া নেই।

হুমড়ি খেয়ে বিছানার ওপর পড়ে হাত বাড়িয়ে চারুশীলা টের পেলেন মাধব বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ছেলের কপাল ধরতে গিয়ে চারুশীলার হাতে জল ঠেকল, গরম জল।

'তুই কাঁদছিস বাবা!'

স্পষ্ট কান্নার ফোঁপানি শুনলেন তিনি।

'হ্যাঁ' বিকৃত কণ্ঠস্বর মাধবের। মার হাতটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল : 'খবরদার জানালা খুলো না, তুমি যাও—তুমি সরে যাও এখন এখান থেকে, তুমি কি একটু সময় আমায় একলা থাকতে দেবে না!'

কি যেন বুঝলেন চারুশীলা, কি যেন বুঝলেন না। বিমূঢ় হয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দুর্বোধ

মেয়েটার কপাল ভাল। এমন হুট করে রুবির বিয়ে হয়ে যাবে কেউ আশা করেনি। এক গুচ্ছের আইবুড়ো মেয়ে আছে হোস্টেলে। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বয়স। সব শিক্ষয়িত্রী। গরীব স্কুলের স্বল্প মাইনে পেয়ে তারা তুষ্ট। তাদের অর্থলোভ থাকাটা শোভন নয়। বিলাস-ব্যসন বর্জন করে বিদ্যাদাত্রীর কঠোর পবিত্র জীবন কাটানো যদি তোমার স্বপ্ন হয় আদর্শ হয় তবে আমাদের সঙ্গে এসে থাকো। আমরা আলোভরা রঙিন জীবনের মুখ দেখব না, দেখতে চাইব না। এই প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে তোমাকে দশটা পাঁচটা কচি মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। কঠোর শ্রম। প্রতিদান আশা করবে না। তারপর যদি একটি মেয়ে ভাল হয়, এই আমতা গার্লস স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম দশটি আসনের একটি আসনও দখল করতে পারে, তখন—সেদিন তুমি মনে করবে তোমার জীবন ধন্য, তোমার শিক্ষয়িত্রী জীবন সার্থক হয়েছে।

সুতরাং একটি মন্ত্র, একটি আদর্শ ছাড়া আর কিছু ভেবো না, আর কিছু চেয়ো না। রুবিও এই আদর্শ সামনে রেখে দশটা বছর কাটিয়েছে। আরও কতকাল কাটাতো কে জানে। কিন্তু তা তো হল না। হুট করে ওর বিয়ে হয়ে গেল। প্রস্তাব দিয়েছিল রুবির এক মামাতো ভাই। দিল্লীর বড় চাকুরে। তার অফিসে ছেলে চাকরি করে। ছ'শ টাকা মাইনে। রুবি একবার ছুটি নিয়ে দিল্লী আসুক। হয়তো দেখলে সমীরের পছন্দ হয়ে যাবে। খুব ভাল ছেলে সমীর। মার্জিত শিক্ষিত বিনয়ী এবং স্বাস্থ্যবান।

রুবির বুকের ভিতর দুরদুর করছিল অরুণদার চিঠি পেয়ে। একটা স্বপ্ন, একটা মরীচিকা। তাই কি? আর পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী চেপে ধরেছিল রুবিকে—'না না, এই চান্স তুই নষ্ট করবিনে। যা তো একবার—বেশি দিন না—এক হপ্তার ছুটি নিয়ে চলে যা দিল্লী। মাথা নেড়ে রুবি বলেছিল, 'ধ্যেৎ! বুড়িয়ে গেছি, এখন আমায় বিয়ে করবে কে।'

'করবে না আমরাও ধরে রাখছি—তা হলেও একবার বেড়িয়ে আসতে দোষ কি—তোমার মামাতো ভাইয়ের বাসা আছে সেখানে। অসুবিধে কিছু হচ্ছে না যখন—'

রুবি কথা নিয়েছিল। পাঁচজন চটপটে হাতে রুবির স্যুটকেস গুছিয়ে দিয়েছিল, রুবির দিল্লী এক্সপ্রেসের ভাত রান্না করে দিয়েছিল, রুবিকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

দিল্লী পৌঁছে সাতদিন পর নীল খামে করে রুবি মোটা চিঠি পাঠিয়েছিল আমতা হোস্টেলের ঠিকানায়। সর্বজ্যেষ্ঠা শিক্ষয়িত্রী নীহারদির নামে চিঠি। কিন্তু চিঠি সকলের কাছে লেখা: 'কাল আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। হুঁ, রেজিস্ট্রী করে। তোমরা সবাই আমাকে আশীর্বাদ করো। ভালবাসা জেনো। ইতি রুবি।'

আমতা গার্ল'স স্কুলের গরীব হোস্টেলের পাঁচজন টিচার সেদিন রুবির শুভ জীবন কামনা করে বাজার থেকে একটা ভাল মাছ ও মাংস আনিয়ে রান্না করে 'ফিস্ট' করেছিল। এবং প্রাক্তন টিচার রুবি সান্যালের নতুন দাম্পত্য জীবনকে আশীর্বাদ জানিয়ে মোটা খামে করে দিল্লীর ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিল। চিঠিতে পাঁচটা সই ছিল।

সেই রুবি মুখভার করে তার কনট প্লেসের মতন সাজানো ঘরে চুপচাপ বসে আছে। বড় বাড়ি। শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর জা ননদ নিয়ে রুবির বড় সংসার। এদিক থেকে রুবি সুখী। কেন না একলা থাকা তার স্বভাব নয়। আমতার হোস্টেলে পাঁচজন নিয়ে

তার দীর্ঘকাল কেটেছে। যদি সমীর আলাদা বাসা করে রুবিকে নিয়ে থাকত, তবে রুবির খারাপ লাগত। বড় সংসারে অষ্টপ্রহর হৈ চৈ হাসি গানের মধ্যে জীবন সতেজ থাকে। ভাসুরের তিনটি ছেলে মেয়ে। ননদ বিধবা হয়ে এখানে আছে। তারও দুটি বাচ্চা। দেওর আছে দুটি। কলেজে পড়ে। শ্বশুর শাশুড়ি ভাল মানুষ। হাসি ছাড়া মুখে কথা নেই। ননদ আর জা রুবিকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছে। রুবির জীবন কাটছিল বেশ। কিন্তু তার মুখ ভার কেন? এত সুখের মধ্যে দুঃখের এক টুকরো কালো মেঘ উদয় হল কবে থেকে, কখন থেকে? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর রুবি দেবে কি?

'হ্যাঁ রে ছোট, চুপচাপ বসে আছিস কেন?' বড় জা এসে ঘরে উঁকি দেয়। 'ঠাকুরপো আফিসে বেরিয়ে গেছে সেই কখন—তা এখানে এমন একলা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিস কি?'

'না কিছু না।' স্বল্প হাসি রুবির পাতলা ঠোঁটে উঁকি দিতে দিতে তখনই মিলিয়ে যায়। 'ভাবছিলাম—'

'হ্যাঁ কি ভাবছিলি?' ছবি শক্ত হয়ে প্রশ্ন করে।

রুবি চুপ থেকে আঙুলের নখ খোঁটে। কি ভাবছে সে, বলবে কেমন করে। বলা যায় কি? তাই নখ খোঁটা শেষ করে ছবির চোখে চোখ রেখে আবার হাসতে চেষ্টা করে। 'কিছু ভাবিনি। এমনি বসে আছি। মাথাটা একটু ধরেছে।'

এবার ছবি হাসে। মানে একটা কিছু গোপন করছে রুবি, বুঝতে তার কষ্ট হয় না।

'বেশ তো, মাথা ধরেছে আমার ঘরে আয়, একটু চা খাবি? মুখ গোমড়া হয়ে একা একা বসে থাকলে মাথা আরো বেশী ধরবে।'

উঠে রুবি ছবির ঘরে চলে যায়। সেখানে তাদের আড্ডা বসেছে। ননদ আর দেবর তাস কাটছে। যেন তারা রুবির অপেক্ষায় ছিল।

'এসো, এসো ছোট বৌ।' ননদ খুশি হয়ে রুবিকে ডাকল।

'আমি আর বৌদি পার্টনার হব।' মিহির রুবির হাত ধরে টেনে পাশে বসাল।

ছবি ঝি-কে ডেকে চার কাপ চা তৈরি করতে হুকুম করে তাস খেলতে বসে গেল।

বেশ কাটছিল। বেশ কাটত। কিন্তু একটা কাঁটা অহরহ রুবির হৃদয়কে খুঁচিয়ে মারছে। কি স্বামীর ভালবাসা? রুবি পেয়েছে। পাচ্ছে। বিয়ের পর এই তিন মাসে সমীর এত ভালবাসা বৌকে ঢেলে দিয়েছে যে আর কোন পুরুষ তা দিত কিনা, দেয় কিনা, রুবি মাঝে মাঝে চিন্তা করে। কিন্তু কাঁটার খোঁচাটা তো বন্ধ হয় না। মিলিটারী অফিসের বড় চাকুরে সমীর। পয়সার অভাব নেই। তা ছাড়া তার দাদাও বড়লোক। গভর্ণমেণ্টের এঞ্জিনিয়ার। কাজেই আয়টা অনুমান করা যায়। সমীরের বাবা জজ ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে মাস মাস মোটা টাকা পেন্সন টানছেন। সুতরাং সমীর তার আয়ের একটা মোটা অংশ বৌয়ের জন্য খরচ করতে পারছে। রুবির জন্য এই তিন মাসে কত টাকার শাড়ি-গয়না এটা-ওটা এসেছে হিসাব করলে বোঝা যায়। কিন্তু শাড়ী গয়না কি সব? তবে কি? না সমীর কোন রাত্রে বাড়ী ফেরেনি। এই তিন মাসের জীবনে রুবি দেখল না।

'টিফিন খেয়েছিলে বিকেলে—মিহির প্রবীর বা মেজদিকে নিয়ে একটু বেড়াতে টেরাতে যাও তো?' ঘরে ফিরে সমীর প্রশ্ন করে।

রুবি ঘাড় নাড়ে।

যেদিন তাসের আড্ডা জমেনা সেদিন সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে যায়।

'আমি সুখী—সত্যি আমার জীবন সুখের।'

—যেন হেসে স্বামীকে বলতে গিয়ে রুবি হঠাৎ মুখ কালো করে ফেলে। চোখ অন্যদিকের দেয়ালে চলে যায়।

'কি হল?' সমীর জামা কাপড় ছেড়ে সিগারেট ধরায়।

'মাথা ধরেছে।' মুখ না ফিরিয়ে রুবি কথা বলে।

'প্রায়ই তোমার মাথা ধরে—আমার মনে হয়—আমার যেন মনে হয় তোমার চোখের দোষ হয়েছে। না হলে রোজ মাথা ধরবে কেন। বেশ তো, মিহিরকে নিয়ে কর্ণেল চোপরার কাছে একদিন যাবে—চোখটা দেখাও?'

রুবি মাথা নাড়ে।

'চোখ ঠিক আছে। চোখে কোন দোষ হয়নি।'

'তা তুমি কি করে বুঝবে। স্পেশালিস্ট ছাড়া—' সমীর থেমে যায়। সিগারেটের ছাই ঝাড়ে। কেন না রুবির একটা লম্বা নিঃশ্বাস সমীর শুনতে পেয়েছে। এই নিঃশ্বাসটা সমীর অপছন্দ করে।

রুবি ঘাড় ফেরায়।

'কটা বাজে?'

সমীর হাতঘড়ি দেখে।

'এগারোটা পঁয়তাল্লিশ।'

'মানে পৌনে বারোটা।', রুবির কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'হ্যাঁ, আজও একটু রাত হল।' সমীর চোখ তোলে না। রুবি স্বামীর দিক থেকে চোখ সরায় না। যদি সমীর মুখ তুলে তাকাত, দেখত রুবির ভুরুতে নাকে ডগায় ঠোঁটে ঘৃণার কুঞ্চন। স্বামীকে সে ঘৃণা করছে?

'আজও তোমার মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে?'

ক্ষীণ গলায় সমীর হাসল।

'সাহেবসুবোর পাল্লায় পড়ে সামান্য একটু—?

স্বামীর কথা শেষ করতে দেয় না রুবি।

'একটু কেন, বেশ খেয়ে এসেছ, তোমার চোখ বলছে। যখন ঘরে ঢোক তোমার পা টলছিল।'

অধোবদন হয়ে সমীর সিগারেট টানে।

দেয়ালের কাছে সরে যায় রুবি। সেখানে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলে—'রোজ রাতে মদ খেয়ে চোরের মত বাড়ীতে ঢুকছ—তোমার লজ্জা নেই।'

'কিন্তু আমি তো কারোর ক্ষতি করছি না'

সমীর হাসতে চেষ্টা করল। রুবির কঠিন চেহারা দেখে হাসি নিভে গেল।—'আমি সংসারের সব দাবী দাওয়া মিটিয়ে মাঝে মাঝে একটু—'

'ক্ষতি করছ না কারোর সত্যি,—কিন্তু তুমি নিজের যে ক্ষতি করছ তা বুঝতে পার না।' একটু থেমে ফের অন্যদিকে তাকিয়ে রুবি নিজের মনে বলল, 'আমি কি জানতাম, উঃ যদি জানতাম একটি মাতাল আমার স্বামী!'

আজ তাসের আড্ডায় বসে রুবি প্রথম যেদিন স্বামীর মুখে খারাপ গন্ধটা পেয়েছিল তারপর থেকে কাল পর্যন্ত প্রতি রাত্রের ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখছিল। আর মনে মনে শিউরে উঠছিল।

'বৌদির খেলায় মন নেই।' মিহির বলছিল।

'শরীরটা বোধ করি ভাল নেই রুবির।' ননদ বলছিল।

বড় জা ছবি তখন বলেছে, 'থাক আর খেলে কাজ নেই—তোমার যখন মাথা ধরেছে একটি চুপচাপ 'শুয়ে থাকগে—'

রুবি আস্তে আস্তে আড্ডা থেকে সরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। লজ্জা। লজ্জা। রুবি কি করে তাদের বলবে কেন তার মনে অশান্তি—কোথায় তার ক্ষত।

লোকে মদ খায়, মাতাল হয়ে রাস্তায় ঘাটে গড়াগড়ি যায়, আবোল তাবোল বকে। দেখে মানুষ গালিগালাজ করে, হাসে, কেউ বা অনুকম্পা করে লোকটার অধঃপতনের বিচিত্র সব কারণ চিন্তা করতে করতে সরে যায়। সেটা ভাল।

আর এ ঘরের মাতাল ?

ধীর স্থির নির্বিকার।

দিনের সমীর, আর রাতের অন্ধকারের সমীর! রুবি কদিন থেকে কেবল তাই ভাবছে। আশ্চর্য, কি করে এ হয়। দিনের আলোয় যে মানুষ এমন সুস্থ, সৌম্য, নির্মল—যার মুখের হাসি বলা যেতে পারে শিশুর মত—রাতে তার এই কুৎসিত কদর্য রূপ! বিছানায় মুখ গুজে রুবি কাঁদল। বিশ্বাস হয় কি—শিক্ষিত, ধনী, আভিজাত্যে ঝকমক করছে এক পরিবারের ছেলে গভীর রাতে রোজ মাতাল হয়ে টলতে টলতে ঘরে ঢোকে? রাত বারোটা অবধি তার বাইরে কাটে ?

মাথা ধরার ছল করে রুবি খেতে গেল না। অনেক রাত্রে ফেরে বলে সমীরের ভাত এ-ঘরে টেবিলে এনে ঢেকে রাখা হয়। ভাত রেখে ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে রুবি উঠে বসল। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে। বস্তুত যদি এখন কেউ রুবির চোখ মুখের দিকে তাকালে ভয় পেত। একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য। তাই রুবি প্রতিজ্ঞা করেছে আজ একটা চূড়ান্ত কিছু করবে। স্বামী ঘরে ঢুকলে সে শ্বশুর শাশুড়ি জা ননদ দেওরদের এ ঘরে ডেকে আনবে। আপনারা দেখুন—তোমরা দেখ, চিনে রাখ বাড়ীর ভাল ছেলেকে। দিনের বেলায় যে এত ভদ্র বিনয়ী প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন—রাত্রে সে কতটা উচ্ছৃঙ্খল অসভ্য হতে পারে।

রুবির কেবলই মনে পড়ছে আমতার হোস্টেলের কথা। শান্ত নিরুপদ্রব শুচি-স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর জীবন। নীহারদি, রেণু, পূরবী, শোভনা। তোমরা দেখে যাও আমার জীবন কতবড় এক ভণ্ড

কাপুরুষকে নিয়ে কাটছে। মদের গন্ধ মুখে নিয়ে সমীর যতদিন রুবিকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে রুবি বিছানার পাশে সরে গেছে। বাড়াবাড়ি দেখলে খাট থেকে নেমে মেঝেয় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ঘরের আবিল বাতাস থেকে ও মুক্তি পায়নি। বিষাক্ত বাতাস নাকে না ঢোকে এভাবে প্রায় দম বন্ধ করে সে কোন মতে রাত কাটিয়েছে। তারপর ভাল করে রাত ভোর হবার আগে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ননদ ও জা ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে বলে, 'রুবির ঘুম কম। এত কম ঘুম যে মনে হয় রুবি বুঝি বুড়িয়ে গেছে। ওদিকে তো কত রাতে ঘুমোয়, কত রাতে ঠাকুরপো ঘরে ফেরে।'

শুনে চুপ করে থাকে রুবি। জায়ের কথার উত্তর দেয় না।

কিন্তু আজ সব কথার উত্তর দেবে সে, আজ সবাইকে বলবার সময় এসেছে।

দেয়ালে পিঠ রেখে রুবি রাতের প্রহর গুনছে। এগারোটা বাজল। বারোটা বাজল। ঘুমে বাড়ী অসাড় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রুবি একটু সময় তার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে একরাশ তারা দেখল। কালো আকাশে একরাশ যুঁই ফুল ছড়িয়ে আছে।

তিন তলায় রুবির ঘর।

রুবির ঘরের ওপর বাড়ীর ছাদ, আকাশ।

সুতরাং অনেক রাতে ছাদে ওঠার সুবিধা তার আছে।

চৌকাঠ পার হয়ে বারান্দায় এল তারপর সরু সিঁড়ির প্যাসেজ ধরে ওপরে উঠে গেল।

মুক্ত আকাশ। মুক্ত বাতাস। বুক ভরে রুবি নিঃশ্বাস নিতে পারল। রাতের স্নিগ্ধ শীতল আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে নিজেকে সে বড় পবিত্র শুদ্ধ মনে করতে লাগল। এখন থেকে এখানে এসে সে রাত কাটাবে। পূর্ব আকাশ ফরসা হবার আগে নিচে নেমে গেলে চলবে। একটা বড় আশ্রয় পেল ও। এসব ভেবে ছাদের

আলিসা ধরে কতক্ষণ ও দাঁড়িয়ে কাটাল বুঝল না। যেন সময়ের জ্ঞান ছিল না তার। এক সময় চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল, পা দুটো টনটন করছে—স্তূপ স্তূপ আলস্য এসে ভর করেছে শরীরে। রাস্তার ওপারে গাছের মাথায় একটা পাখী ডানা ঝাপটায়, রুবি শুনল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রুবির মনে হ'ল সমীর ঘরে ফেরেনি—হ্যাঁ, রাত দুটো বাজবে এখন—রাত দুটোয় যে লোক ঘরে না ফেরে সেই লোক রাত তিনটেয় ফিরবে তার নিশ্চয়তা কি। তিনটে চারটে—পাঁচটা—সকাল। রোদ উঠেছে। রোদ মাথায় নিয়ে লাল চোখ বিস্রস্ত বসন উচ্ছৃঙ্খল মাতাল ঘরে ফিরছে। ভাল, ভাল বাড়ীর সবাই দিনের আলোয় মাতালের ঘরে ফেরা দেখ। দেখ, চিনে রাখ তোমাদের ভদ্র অমায়িক শিক্ষিত রুচিবান সমীরকে। যেন অস্থির উত্তেজনা বুকে নিয়ে রুবি সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। তাকে আর কিছু বলতে হবে না। সমীর নিজেই তার পরিচয় দিতে বাইরে রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ী ফিরছে। পাপ কখনো চাপা থাকে? ঘরে ঢুকে রুবি আলো জ্বালল। দৃশ্যটা দেখে প্রথম ও খুব চমকে উঠল। তারপর সামলে নিল। তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মানুষটাকে। মুখ কাত করে মেঝের ওপর পড়ে আছে। যেন বাইরে কোথাও পড়ে গিয়েছিল। পেছনে কাদার দাগ। এক পায়ের জুতো খোলা হয়েছে, আর এক পায়ের জুতো খোলা হয়নি। যেন জুতো খুলতে খুলতে এক সময় মেঝেয় ঢলে পড়েছে। পাট করা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। মাতাল ঘুমোচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাসের গাঢ় মন্থর শব্দ রুবি শুনতে পাচ্ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল ও অচেতন ঘুমন্ত মুখটা। দিনের বেলায় যে মুখ শিশুর মুখের মতো সরল। মনে হয়, এখনও তাই মনে হচ্ছে। নিষ্পাপ নির্লিপ্ত শান্ত করুণ। দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন কী হল রুবির। নুয়ে গলা বাড়িয়ে মুখটা ওই মুখের কাছে নিয়ে যায়। তারপর সাপ দেখে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, আঁতকে ওঠে, রুবির অবস্থা তাই হল।